ইন্দুবালা ভাতের হোটেল
আজকের মেনু
ভাত
বিউলির ডাল
আলু পোস্ত
চিংড়ির ঝোল
আমড়ার চাটনি
কল্লোল লাহিড়ী

ইন্দুবালা ভাতের হোটেল

কল্লোল লাহিড়ী

Indubala Bhaater Hotel

by

Kallol Lahiri

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ২০২০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: মেখলা ভট্টাচার্য্য।

ISBN 978-81-9460-090-9

ঋণ

ঠাম্মা, মনি, দিদা, রাঙা, বড়মা আর মা। এছাড়াও বাংলার সেইসব অসংখ্য মানুষদের যাঁদের হাতে এখনও প্রতিপালিত হয় আমাদের খাওয়া দাওয়া। জিভে জল পড়ার ইতিহাস।

আজকের মেনু
ভাত
কুমড়োফুলের বড়া
সোনামুগ ডাল
কুমড়োর ছক্কা
আম কই
মুড়িঘন্ট
জলপাইয়ের চাটনি

এক

কুমড়ো ফুলের বড়া

জানলার কাছে বসন্তের নরম রোদে সার দিয়ে সাজানো আছে কাঁচের বড় বড় বয়াম। মুখ গুলো ঢাকা আছে পরিষ্কার সাদা কাপড়ের ফেট্টিতে। বয়াম গুলোকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না তার মধ্যে কি রসদ লুকিয়ে আছে। কিন্তু যারা এই বাড়িতে রোজ ভাত খেতে আসে তারা ঠিক জানে। ভাতের পাতে লেবু, নুন, লঙ্কা দেওয়ার পাশাপাশি উড়ে বামুন ধনঞ্জয় একটু করে শালপাতায় ছুঁয়ে দিয়ে যায় বয়ামের সেই লুকোনো সম্পদ। কামরাঙা, কতবেল, জলপাই কিম্বা কোনদিন পাকা তেঁতুলের আচার। নতুন কাষ্টমাররা অবাক হয়ে যায়। আর পুরোনো লোকেরা ভাবে আজ কোনটা পাতে আসবে? শুধু আচারের টানেই না, এই হোটেলে ভিড় লেগে থাকে পুব বাঙলার এক বিধবা মহিলার হাতের রান্না খেতে। ইন্দুবালা কবে যে এই ভাতের হোটেল শুরু করেছিলেন আর কেন করেছিলেন নিজেও ঠিক মনে করতে পারেন না। তবু ভাসা ভাসা ছবির মতো মনে পড়ায় অনেক কিছু। শুধু সেবার যখন কোলের এক মেয়ে আর ছোট্ট দুই ছেলেকে নিয়ে বিধবা হলেন। সেদিন থেকে বুঝতে শুরু করেছিলেন যারা এতোদিন ঘিরে রাখতো তাদের। সুযোগ সুবিধাটা ঠিক মতো আদায় করে নিয়ে যেত তারাই এখন ছায়ার মতো সরে যাচ্ছে। স্বামীর জুয়া আর মদের নেশায় এতোদিন যারা আট-কপাটি পর্যন্ত বিক্রি করার সায় দিয়েছিলো তাদেরও আর দেখা গেল না বড় একটা।

তখনও খুলনা থেকে মাঝে মাঝে ভাইরা এসে খোঁজ খবর নিয়ে যেত। মা পোঁটলা করে পাঠাতো ভাজা চিড়ে, মুড়ি, বাড়ির সজনের ডাটা, চুইঝাল।

তারপর সেটাও বন্ধ হল। যুদ্ধ বাধলো। ভাইদের অনেক দিন কোন খোঁজ পেলেন না। একদিন সকাল বেলায় গাঁয়ের থেকে পালিয়ে আসা এক লোকের কথায় জানতে পারলেন পুড়িয়ে দিয়েছে সব কিছু পাকিস্তানী মিলিটারীরা। মা, ভাই, বোন আর কেউ বেঁচে নেই। এমনকি ভিটে বাড়িটাও। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যেদিন উড়লো। ইন্দুবালা নীচের ঘর ঝাঁট দিয়ে উনুন ধরালেন। ভাড়ারে চাল ছিল বাড়ন্ত। ছেলে মেয়ে গুলো ক্ষিদের জ্বালায় তারস্বরে কাঁদছিল। পাওনাদার দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। লছমি মাছওয়ালী শেষ বাজারে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলো। আর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পুরনো দোতলা বাড়িটার সামনে। একটা বছর পঁচিশের মেয়ে সদ্য বিধবার সাদা ধবধপে শাড়িতে এলোচুলে চুপ করে বসে আছে ধরে ওঠা উনুনটার সামনে। উনুনে গুলের আঁচে ফর্সা মেয়েটার মুখ লাল হয়ে আছে। ওদিকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে চিল শকুনের মতো পাওনাদাররা। লছমীর যেন কি একটা মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে। একটুও সময় নষ্ট করেনি সে। সোজা এসে দাঁড়িয়েছিল ইন্দুবালার সামনে। গ্যাঁট থেকে আট আনা বার করে মেঝের ওপর রেখে দিয়ে বলেছিল, "আজ তোমার বাড়িতে দুটো ভাত মুখে দেব মাজি। কছু মনে করো না। বারোটা পঁচিশের ক্যানিং লোকাল ছুড়ে গেল যে। এখন দুটো পেটে না পড়লে বাড়ি ফিরতে সাঁঝ হয়ে যাবে। আর শলীল চলবে না মাজি।"

ইন্দুবালা হ্যাঁ না কিছু বলেনি। তাদের খুলনার বাড়িতে অতিথিরা কোনদিন না খেয়ে যায়নি। আজও সে লছমীকে ফেরত পাঠাতে পারলো না। বলতে পারলো না তার ভাড়ারে ফোটাবার মতো চালটুকু নেই। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে এক আনাও নেই যা দিয়ে সে তার দোরে আসা লছমীকে মুড়ি কিনে খাওয়াতে পারে। সাত-পাঁচ না ভেবে একটু কুণ্ঠা নিয়েই সে লছমীর দেওয়া টাকাটা আঁচলে বাঁধলো। উনুনে চাপালো এক হাঁড়ি জল। ছোট মেয়েকে দোতলার ঘরে ঘুম পাড়িয়ে এসে বড় ছেলে প্রদীপকে পাঠালো সামনের মুদিখানার দোকানে। খিড়কির দরজা খুলে নিজে বাড়ির পেছনের বাগান থেকে নিয়ে এলো সবে কচি পাতা আসা কুমড়ো শাক, গাছের পাকা লঙ্কা। শাশুড়ির আমলের পুরনো ভারী শিলটা পাতলো অনেক দিন পরে। যত্ন করে ধুয়ে সেই কবেকার প্রাচীন

হীম শীতল পাথরটার ওপর রাখলো সর্ষে দানা। শিল আর নোড়ার আদিম ঘর্ষনে খুলনা থেকে পাঠানো মায়ের শেষ সর্ষে টুকু বেটে ফেললো ইন্দুবালা অল্পক্ষণের মধ্যেই। লোহার কড়াইতে জল মরতে থাকা সবুজ ঘন কুমড়োশাকের ওপর আঁজলা করে ছড়িয়ে দিল সর্ষের মন্ড। কয়লার আঁচে টগবগ আওয়াজে ফুটতে থাকলো কচি শাক গুলো। তার নরম পাতা গুলো। সাঁতলানোর ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়লো গোটা বাড়িতে। দোতলার ঘরে খুকু চোখ খুলে হাত পা নেড়ে খেলতে থাকলো। ছোট দুই ছেলে ভাত খাওয়ার বাসনায় থালা নিয়ে এসে বসে পড়লো রান্নাঘরের দরজায়। তখনও লঙ্কা গুলোর গা থেকে ঝাল মিশছে কুমড়ো শাকের হালকা সবুজ মাখো মাখো সর্ষে ঝোলে।

রান্নার পাট শেষ হলে ইন্দুবালা ওপরের ঘরের তাক থেকে পাড়লেন গতবারের তেঁতুলের আচার। আসন পেতে লছমীকে যত্ন করে খাওয়ালেন। ফেরার সময় পয়সা ফেরত দিতে গেলে লছমী বললো, "এ কিরম বাত হল মাজি? কাল যে আবার খাবো। হর রোজ পয়সা দেব না কি তোমায়? ওটা তুমি রেখে দাও।"

লছমী সেই যে গেল পরের দিন ফিরে এলো আরও তিনজনকে নিয়ে। এইভাবে আস্তে আস্তে বাজারের সবাই এসে খাওয়া শুরু করলো ইন্দুবালার নীচের ঘরে। একদিন উড়িষ্যা থেকে এলো ধনঞ্জয়। কেউ তাকে ডাকেনি। কেউ কথা বলেনি। দরজার কাছে শুধু ভাত খাওয়ার জন্য বসেছিল বেচারা। বড় মায়া হয়েছিল তাকে দেখে ইন্দুবালার। ওই বয়সের একটা ভাই ছিল যে তার। খান সেনারা জ্বালিয়ে দিয়েছে নাকি তাকে। আর একটুও মনে করতে চাননি সেসব কথা। অনেকটা ভাত আর ডাল দিলে চেটে পুটে খেয়ে নিয়েছিল সবটা ধনঞ্জয়। ছেলেদের খাইয়ে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে এসে ইন্দুবালা দেখেছিলেন সব কিছু সাফ সুতরো। থালা বাটি ধোওয়া। এমনকি মাটির উনুনটা পর্যন্ত সুন্দর করে ল্যাপা। সেই থেকে ইন্দুবালার সংসারে থেকে গেল উড়িষ্যার কোন এক খরা পিড়িত অজ গাঁয়ের ধনঞ্জয়। সিঁড়ির নীচটা সাজিয়ে নিল তার নিজের মতো করে। সামনের কালেক্টর অফিসের

বড়বাবু খেতে এসে খুশি হয়ে একটা হলুদ রঙের এনামেল বোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন। সেখানে জলজল করে লেখা থাকলো ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। পুরসভা থেকে লাইসেন্স হলো। দুই ছেলে বড় হল। তারা দিব্য লেখাপড়া করে সুন্দর বিয়ে করে টুপটাপ সরে পড়লো। মেয়ে গেল জামাইয়ের সাথে পাঞ্জাবে, হিল্লিতে দিল্লীতে ঘুরে ঘুরে সংসার করতে। ইন্দুবালা একা থেকে গেলেন তাঁর ভাতের হোটেল নিয়ে।

একা কেন থাকলেন? তার একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যান দেওয়া যেতই। কিন্তু তাহলে এক তরফা ইন্দুবালার কথা শুনলে চলতো না। তার সাথে তার দুই ছেলে এবং এক মেয়ের কথাও শুনতে হতো। চার পক্ষের কথা শুনলে মনে হতো এতো বাঙালীর চেনা গল্প। মা মানিয়ে নিতে পারছেন না ছেলেদের সংসারকে। আর ছেলেরা বলতো মা বড় বেশি নিজের মতো করে চলতে চাইছে। আর কোন কালেই তো মেয়ের বাড়িতে বাঙালি মায়েরা থাকতে খুব আহ্লাদিত হননি। কিন্তু কিন্তু করেছেন। কাজেই মেয়ের দিকের দরজায় অনেক আগেই খিল তুলে দিয়েছেন ইন্দুবালা। যদিও খোঁজ খবর নেওয়া। এসে দেখাশুনো করা এই সবই তারা করেছে। এমনকি মায়ের নিয়মিত ডাক্তারী চেক-আপও। নাতিরাও আহ্লাদ করে নাত বউ নিয়ে আসে। ঠামুনের খবর রাখে। কিন্তু বুড়ি নিজে এইসব জাগতিক মায়ার ছেদো বাঁধনে একটুও আটকা পড়তে চান না। একদিনও ভাতের হোটেল বন্ধ হয়নি লছমীর খাওয়ার দিন থেকে। বন্যা, কলেরা, ডেঙ্গু, দাঙ্গা, কারফিউ কোন কিছুতে ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের উনুনে আঁচ নেভেনি। ভাড়ারে বাড়ন্ত হয়নি চাল। পেছনের বাগানের কুমড়ো শাক। আজ ইন্দুবালার বয়েস যখন সাতের ঘর ছুঁয়ে ফেলেছে তখন ছেলেরা মাকে এই ব্যবসা বন্ধ করতে বললে, নিজের হাতে রান্না বান্না না করার ফরমান জারি করলে অশান্তি বাধে কাল বৈশাখীর মতো। ফলে বেশ কিছুদিন মুখ দেখেদেখি বন্ধ থাকে দু-পক্ষের। তখন শিব রাত্রির সলতের মতো বিজয়া, পয়লা বৈশাখের নমস্কারটুকু টিকিয়ে রাখে নাতি-নাতনিরা। আর ইন্দুবালার টিফিন কৌটো ভর্তি থাকে পৌষের পিঠেতে। বর্ষায় ভাপা ইলিশে। গরমের মুড়ি ঘন্টোয়। ধনঞ্জয় সব দিয়ে আসে বুড়ির নাম করা টিফিন

কৌটোতে প্রত্যেকের বাড়ি-বাড়ি। পূর্ণিমায় বুড়ির গাঁটে বাতের ব্যাথা বেড়ে যায়। অমাবস্যায় হাঁটতে পারেন না প্রায়। তবু মলম লাগিয়ে গরম জলের শেঁক নিয়ে রান্না করেন ইন্দুবালা। অতোগুলো লোক আসবে। আঙুল চেটে চেটে খাবে। বায়না করবে একটু শুক্তোর জন্য। একটু মাথার মাছের মাথা দিয়ে করা ডালের জন্যে। পরিতৃপ্ত চাঁদপানা মুখ গুলো দেখতেও ভালো লাগে যেন। এদের খাইয়েও সুখ। ইন্দুবালা তাই কোনদিন কোন তীর্থে যাননি। ধম্মো কম্মো করেননি। ঠাকুরের কথামৃতের বানী মনের মধ্যে আউড়ে গেছেন। নারায়ণ সেবা। জীবে প্রেম।

তবে আজকে পূর্ণিমা, অমাবস্যা গ্রহণের মার প্যাঁচ না থাকলেও পায়ের ব্যাথাটা বড্ড বেড়েছে মনে হচ্ছে ইন্দুবালার। সকালে পাঁজি খুলে আঁতি পাতি দেখেছেন কোথাও কোন বক্র দৃষ্টি নেই গ্রহের। তবুও বাড়ির পেছনের বাগানের সিড়িটা দিয়ে নামতেই হড়কে যাচ্ছিলেন আর একটু হলেই। কবে থেকে ধনঞ্জয়কে বলে যাচ্ছেন ওরে চুন ফেল। একটু নারকেল ঝাঁটা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার কর। তা কে শোনে কার কথা। থাকতো সেই আগের বয়েস কারো কাজের জন্য তিনি বসে থাকতেন নাকি? ওই দশ কেজি চালের ভাত নিজে করেননি এক সময়? ফ্যান গালার সময় লোক গুলো এসে দাঁড়িয়ে থাকতো জুঁই ফুলের মতো ভাত দেখার জন্য। ওই কাঁড়ি কাঁড়ি ফ্যান টেনে তুলে দিয়ে আসতেন না পাড়ার কুস্তির আখড়ায়। ছেলে গুলো খেতো পরিতৃপ্তি করে। মা শিখিয়েছিল ভাত হল লক্ষ্মী। তার কিছু ফেলা যায় না। কিছু ফেলতে নেই। কত মানুষ ওই ফ্যানটুকু খেয়ে বেঁচে আছে দুবেলা। এইসব বকতে বকতে ইন্দুবালা সিঁড়ি দিয়ে নামেন। খিড়কির দরজা খোলেন। সেখানেই তো সেই শাশুড়ির আমলের একটা ছোট্ট বাগান। একটা আমগাছ। একটা পেয়ারা। একটা লিকলিকে নারকেল গাছ খাড়াই উঠেছে। এইসব ছাড়াও কয়েক ছটাক জমিতে ইন্দুবালা সাজিয়ে নিয়েছেন তার রান্নাঘরে কাজে লাগার মতো টুকিটাকি সবজী। যেন ফকিরের ঝুলি। কিছু না কিছু তুমি পাবেই। প্রচন্ড পা ব্যাথা নিয়ে এতোটা সিঁড়ি ঠেলে বাগানে এসে ইন্দুবালার মন ভালো হয়ে যায়। গোটা বাগান আলো করে ফুটে আছে কুমড়ো ফুল। তার ওপর বিন্দু

বিন্দু শিশির। এই ভরা বসন্তে এই সুন্দর সকালে শহরের ইট কাঠ পাথরের মধ্যে ডেকে উঠলো একটা কোকিল। ইন্দুবালা কুমড়ো ফুলের ওপর হাত বোলালেন। কোথা থেকে যেন পুরনো কলকাতার এঁদো গলির দোতলা বাড়ির ছোট্ট বাগান হয়ে গেল খুলনার কলাপোতার নিকানো উঠোন। মাটির উনুনে শুকনো খেজুর পাতার জিরানো আঁচ। আর চাটুর ওপর ছ্যাঁক ছুক করে ভাজতে থাকা কুমড়ো ফুলের মিঠে বড়া। নামানোর সময় ঠাকুমার তার ওপর যত্ন করে ছড়িয়ে দেওয়া অল্প কিছু পোস্তর দানা। বাটি হাতে করে বসে থাকা ছোট্ট ইন্দুবালা আর তার ভাইয়েরা। ঝপ করে একটা সকাল নিমেশে পালটে দিল ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের আজকের মেনু। এক ঝুড়ি কুমড়ো ফুল তুলে নিয়ে এসে দোকানের সামনের কালো বোর্ডে চক নিয়ে লিখলেন বুড়ি ভাত, ডাল, কুমড়ো ফুলের মিঠে বড়া, সরষে মাছ, জলপাইয়ের চাটনি। ধনঞ্জয় গাঁক গাঁক করে উঠলো তার দেশওয়ালী ভাষায়। রেগে গেলে বাংলা তার ঠিক আসে না। আলুভাজা হওয়ার কথা ছিল। সরষে মাছের জায়গায় পটল আলু ফুলকপির ঝোল হওয়ার কথা ছিল তা কিনা কুমড়ো ফুলের মিঠে বড়া? ইন্দুবালা কোন কথা কানে তুললেন না। উত্তর দিলেন না। স্নান করে ধপধপে সাদা কাপড়ে রান্না ঘরে ঢুকলেন।

বেলা যত বাড়তে থাকলো চারিদিকের আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল কুমড়ো ফুলের মিঠে বড়া ভাজার গন্ধে। সামনের মেস বাড়ির ছেলে গুলো আজ বড় তাড়াতাড়ি ভাত খেতে এলো। কালেক্টর অফিসের কেরানীকুল বাড়ি থেকে খেয়ে এসেও দুপুরে চাড্ডি ভাত বেশি খেতে চাইলো। কবেকার খুলনার এক উঠোন রান্না জড়ো হল ইন্দুবালার হোটেলে। সবার খাওয়ার তারিফ যখন তিনি রান্না ঘরের মধ্যে থেকে পাচ্ছিলেন। ছেলে ছোকরা গুলো দিদা বলে এসে যখন জড়িয়ে ধরে, আদর করে চলে যাচ্ছিল ঠিক তখনি তার সেই পড়ন্ত বেলার হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা ক্যাব। নেমে এলো যে মেয়েটি সেও প্রায় বছের দশেক পরে ফিরছে কলকাতায়। আর তারও বছর দশেক পরে এই ইন্দুবালা ভাতের হোটেলে। মেয়েটির ছোট করে কাটা চুল, মেয়েটির হাব-ভাব, মেয়েটির পোষাক, তার বিদেশী লাগেজ, কাস্টমারের ভাত খাওয়ার

ছন্দ পতন ঘটায়। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। এই সময়ে এই ছেনু মিত্তির লেনে পরী এলো কোথা থেকে? মেয়েটি সটান গটমট করে এগিয়ে আসে। চোখের রোদ চশমাটা মাথার ওপর তোলে। হেলে যাওয়া ক্ষয়াটে এনামেলের বোর্ডে ইন্দুবালা ভাতের হোটেল তার আমেরিকার প্রবাস জীবনে হারিয়ে যাওয়া বর্ণপরিচয়ে পড়তে অসুবিধে হয় না। দরজার সামনে এক ঘর লোকের মধ্যে অস্ফুট স্বরে ডাকে "ঠাম্মি"।

ইন্দুবালা তখন যত্ন করে শেষ কুমড়ো ফুলের বড়াটা ভাজছিলেন চাটুর ওপর। অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরে ঘুরে তাকান। তাঁর হাতে বেসনের প্রলেপ। কপালে উনুনের আঁচের বিন্দু বিন্দু ঘাম। সোনালী ফ্রেমের চশমাটা একটু ঠিক করে এগিয়ে আসেন। ভালো করে দেখেন এক পশলা রোদ ঢোকা রান্না ঘরে মেয়েটার মুখটাকে। "নয়ন না"? জড়িয়ে ধরে সুনয়নী তার ঠাম্মিকে। কোন শব্দ যেন আর বেরোতে চায় না তার গলা থেকে। শুধু ফোঁপানো কান্নায় বোঝা যায় ভাঙা ভাঙা কথা। "আমায় একটু তোমার কাছে থাকতে দেবে ঠাম্মি"? ইন্দুবালা কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁর বড় ছেলের এই মেয়েটি ঠিক তার মতোই। একরোখা। কারো কথা না শুনে, কাউকে তোয়াক্কা না করে কলেজ টপকে চলে গিয়েছিল বাইরে। কোন এক বিদেশীকে বিয়েও করেছিল মনে হয়। তারপর আর কেউ খবর রাখেনি। মেয়েটা যে এই বাড়ির কেউ ছিল। এই বাড়ির কেউ হয় সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল সবাই। শুধু নতুন বছরে একটা করে কার্ড আসতো ইন্দুবালার কাছে। ফুল, লতা পাতা, সূর্য দেওয়া। ইংরাজীতে লেখা থাকতো অনেক কিছু। ইন্দুবালা ওগুলো পড়তে পারতেন না। সাজিয়ে রেখে দিতেন দেওয়ালে। সেই নয়ন?

"আমাকে ভুলে যাওনি তো ঠাম্মি? সবাই ভুলে গেছে আমাকে। বাবা, ভাই, কাকু, পিসি সবাই"।

ইন্দুবালা নাতনির থুতনি ধরে চুমু খান। তাকে শান্ত হয়ে বসতে বলেন রান্না ঘরের ছোট্ট টুলটায়। সামনের টেবিলে শালপাতার থালায় নিজে হাতে ভাত

বাড়েন। মাটির গ্লাসে জল দেন।

“আমার ঠাকুমা কি বলতো জানিস নয়ন? দুপুরের অতিথি হলো মেঘ না চাইতে জল। তাকে পেট পুরে না খাওয়ালে গেরস্থের অমঙ্গল হবে। মাঠ ভরা ধান হবে না। গোলা ভরা ফসল উঠবে না। মা লক্ষ্মী বিরূপ হবেন। ভিটে মাটি ছাড়া করবেন।” সুনয়নী ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার যে ভিটে মাটি কিছু নেই আর। সব গেছে। ইন্দুবালা মেয়ের মাথায় হাত বোলান। মিষ্টি কুমড়ো ফুলের বড়া মুখের সামনে ধরে বলেন, “দ্যাখ তো দিদিভাই মনে পড়ে কিনা কিছু?”

সুনয়নীর কিছু মনে পড়লো কিনা বোঝা যায় না। তখন সে তার সদ্য ছেড়ে আসা স্প্যানিশ বয় ফ্রেন্ডের বিশ্বাসঘাতকায় ব্যাকুল। কিন্তু ইন্দুবালার মনে পড়লো সুনয়নীর জন্ম হয়েছিল এমনই এক ঝলমলে দুপুরে। সেদিন ছিল বাসন্তী পুজো। তিনি সারাদিন উপোষ করে ছিলেন। বাটিতে ভেজানো ছিল নতুন ছোলা। কুমড়ো গুলো ডুমো ডুমো করে কাটা ছিল। দয়া গোয়ালিনী দিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে পাতা ঘি। ইচ্ছে ছিল কুমড়োর ছক্কা রাঁধার। সেদিনও এমন বিকেল হয়েছিল সব কিছু সারতে। বাড়িতে পাতা ঘি আর হিংয়ের গন্ধ ওঠা কুমড়োর ছক্কায় সারা বাড়ি যখন মো মো করছে তখনই খবরটা এলো হসপিটাল থেকে। বাড়িতে কত দিন পর নতুন লোক এলো। নাতনির টানাটানা চোখ দেখে ভেবেছিলেন সত্যি ঠাম্মাই ফিরে এসেছেন বুঝি খুলনার কলাপোতার বাড়ির সব মায়াটুকু নিয়ে। চোখ চিকচিক করে উঠেছিল ইন্দুবালার। বড় আদর করে নাম রেখেছিলেন নাতনির সুনয়নী।

সন্ধ্যেবেলা ধনঞ্জয় হোটেলে ধূপ দেখাতে এসে দেখলো কালো বোর্ডে লেখা আছে রাতের মেনু। রুটি, কুমড়োর ছক্কা, শিমাইয়ের পায়েস। ধনঞ্জয় আবার খিটখিট করতে পারতো বুড়ির মেনু চেঞ্জ করার জন্য। কিন্তু আজ সে টু শব্দটি করলো না। বরং বটিটা নিয়ে ইয়া বড় একটা কুমড়ো কাটতে বসলো। আর কেউ না জানুক সে জানে বড় নাতনী সুনয়নী চলে যাবার পর থেকে আর একদিনও এই বাড়িতে কুমড়োর ছক্কা রান্না করেননি ইন্দুবালা।

দুই

বিউলির ডাল

ভাদ্রের যে এমন নাভিশ্বাসের গরম আছে ইন্দুবালা আগে কখনও জানতেন না। কিম্বা ঠাহর করতে পারেননি তেমন। বিয়ের পর ছেনু মিত্তির লেনে এসে বুঝতে পেরেছিলেন শহুরে দমবন্ধ করা পরিবেশ কাকে বলে। গায়ে গায়ে ঠেকানো বাড়ি। চৌকো খোলা ছাদ। বাড়ির ভেতর থেকে একটুস খানি আকাশ। করপোরেশান কলের ছিরছিরে জল। শ্যাওলা ওঠা স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল। বড় সোঁদা সোঁদা গন্ধ। আশে পাশে কোন নদী নেই। পুকুর নেই। তার বদলে বাড়ির সামনে আছে মুখ হাঁ করা বড় বড় নালা। তার দুর্গন্ধ। হুল ফোটানো মশা। গা ঘিনঘিনে মাছি। আর সন্ধ্যে হলেই টিমটিমে বিজলিবাতি। এটাই নাকি কলকাতা। এখানে আসার জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে। গড় হয়ে প্রনাম করে না দেখা কালীঘাটের মায়ের কাছে। বটতলায় সত্যপিরের সিন্নি চড়ায়। মুখের খাবার বন্ধক রাখে ঈশ্বরের কাছে। একবার কলকাতায় আসতে পারলে ট্রাম, বাস, মনুমেন্ট, ফেরিওয়ালার কাছে কাচের চুড়ি। এইটুকু সাধের জন্য এতোটা কষ্ট করা? বাড়ির কোন এক সমবয়সী মেয়েকে কোন একদিন হয়তো নিজের মনের প্রশ্নগুলো করে ফেলিছিলেন ইন্দুবালা তাঁর সহজ সরল ভঙ্গীতে। তাঁর গেঁয়ো বিদ্যে তখনও শহরের মানুষের জটিল মনের তল পায়নি। পরে যে পেয়েছিল তেমনটাও নয়। সারা বাড়ি ছড়িয়ে ছিল কোন এক গাঁয়ের মেয়ের কলকাতাকে দুর-ছাই করার সংবাদে। শাশুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিলেন "কোথাকার কোন রাজরাজেশ্বরী এল রে। পাকা দালান কোঠায় পা পড়ে না। শুনেচি তো সেখানে শেয়াল কুকুর ঘুরঘুর করতো"। তা ঠিক। খুলনার কোলাপোতায় সন্ধ্যে হলে বাঁশ বাগানে শেয়াল ডাকতো। তুলসী তলায় জোনাকিরা ভিড় করে আলো জ্বালাতো। লণ্ঠন লাগতো না। ভাদ্রের এই সময়ে

কাঠ চাঁপার গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরে থাকতো। বিয়ের যেদিন সম্বন্ধ এলো অশ্বত্থ তলায় সেদিন অষ্টমপ্রহর। রাজশাহি থেকে এসেছে কীর্তনের নাম করা সব দল। ছানা এসেছে খুলনা শহর থেকে। বড় ভিয়েন বসেছে সামনের তালতলার রান্নাঘরে। এদিকে বাড়িতে ঠাম্মা বানাচ্ছে তুলতুলে নরম মোমের মতো তালের পিঠে। কলাপাতায় গরম গরম সেই ভাপ ওঠা পিঠে আজও যেন ইন্দুবালার চোখে জলছবি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ততক্ষণে অষ্টম প্রহরের মালসা ভোগের দই চিড়ের জন্য মানুষের কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। ইন্দুবালার তাড়া আছে। সে মালসা ভোগও খাবে। তার সাথে বাড়িতে গিয়ে ঠাম্মার তৈরী তালের পিঠে। এদিকে দূর থেকে ধূর্জটি পিওন আসছে সাইকেলে চেপে। তারস্বরে চিৎকার করছে বাবার নাম ধরে। ও ব্রজমোহন বাবু...শুনছেন...চিঠি আছে। চিঠির কথায় ইন্দুবালা ঘুরে তাকায়। একটু আড়াল নিয়ে দেখতে পায় বাবার হাতে একটা পোষ্টকার্ড। ধূর্জটি পিওন বলে, "মাষ্টারবাবু ইন্ডিয়াতে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন একবার জানাননি পর্যন্ত। এদিকে কি ছেলের অভাব ছিল? আমার ভাইপো তো এখন ঢাকায় সুতোর কলে কাজ করছে"।

বাবা পারতপক্ষে চাননি মেয়ের এদিকে বিয়ে হোক। ভেবেছিলেন তার সোনার বরণ কন্যের যথাযথ মর্যাদা করতে পারবে ওপারের লোকজনেরা। তাই খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বছর পনেরো বয়সে বেশী দোজবরে ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের একমাত্র মেয়ের। বাড়িতে আপত্তি উঠেছিল তীব্র। ঠাম্মা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। মা বলেছিল "এর চেয়ে মেয়েটাকে একটা কলসি আর গামছা দাওনা। হালদারদের পুকুরে ডুবে মরুক"। ভাই গুলো ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। তোদের তখন এতোটাও বোঝার বয়েস হয়নি। তবুও কারো কথা শোনেনি বাবা। আর কেউ না জানুক তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কোন না কোন সময়ে বাপ ঠাকুরদার এই ভিটে ছেড়ে তাদের একদিন চলে যেতেই হবে। সেদিনের ভয়ে তিনি সারাক্ষণ অতীষ্ট হয়ে থাকতেন শেষের দিকে। তাঁকে অবশ্য কষ্ট করে চোরের মতো রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসতে হয়নি। খান সেনাদের ঢোকার

অনেক আগেই তিনি চোখ বুঁজেছিলেন কপোতাক্ষের তীরে। বাপ-ঠাকুরদার ভিটেতে। কোন এক অগ্রহায়ণের শিশিরে ভিজতে ভিজতে। আর বাকিরা জ্বলে পুড়ে মরেছিল স্বাধীনতার আগুনে। বাংলা ভাষার রাষ্ট্র হোক, এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে এক আশ্বিনের রাতে শিউলির গন্ধে।

ইন্দুবালার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে পুজো আচ্ছা হতো বেশী। শনি নামের যে ঠাকুরের পুজো হয় ইন্দুবালা এখানে এসে তার কথা সঠিক ভাবে জানতে পারেন। শাশুড়ি ছেলের মতি গতি ফিরিয়ে আনার জন্য নানা মন্দিরে হত্যে দিতেন। উপোষ-আচ্ছা করতেন। পাঁজি ধরে ধরে ছেলের নতুন বউকেও বাদ দিতেন না। খুব কঠিন নিয়মে বেঁধে রাখতেন। যদিও ইন্দুবালার গ্রামে ঘেটু ষষ্ঠী, ওলাই চন্ডী, পূণ্যি পুকুর ব্রতে এতো কঠোর অনুশাসন ছিল না। চাপড়া ষষ্ঠীতে কাঁঠাল পাতার ভেতরে গুড় আর কলা দিয়ে মাখা আটার সিন্নি খেতে দিব্যি লাগতো। বাড়িতে হতো ক্ষুদের চালের পায়েস। এইসব কথা শুনলে শ্বশুর বাড়ির লোকরা হাসাহাসি করতো। তাচ্ছিল্যের নামে অপমান করতো। সেসব গা সওয়া হয়ে গেছে ততদিনে। পূর্ণিমা-অমাবশ্যায়, তিথি নক্ষত্রের ফেরে ভালো দিনে ইন্দুবালাকে সঙ্গে নিয়ে মানুষে টানা রিক্সায় গঙ্গার স্নানে যেতেন শাশুড়ি। প্রথম দিনের ঘটনা আজও মনে আছে ইন্দুবালার। স্বামী ডেকে এনেছেন এমন এক জিনিস যা দেখতে আধভাঙা ঢাকা ওয়ালা গাড়ির মতো। সামনে টানা দুটো শুড়ের মতো লাঠি। তার মাঝে দাঁড়িয়ে একটা সিড়িঙ্গে মতো লোক। তার হাতে একটা ঝুমঝুমি। এরেই বুঝি টানা রিক্সা বলে? স্বামীর সাথে কথা হয় না শাশুড়ির সামনে। তা ছিল নিয়ম ভঙ্গের সামিল। শাশুড়ি জবাব দেন, “দেখেছো কখনও বাপের আমলে? নাও ওঠো এবার।”

সেই বিষম বস্তুটায় উঠতে গিয়ে ইন্দুবালা কেঁদে ফেলেন আর কি! রিক্সায় বসার সাথে সাথে রিক্সা বুঝি উলটে যায়। শাশুড়ি চিৎকার করে বলেছিলেন, “বাঙাল মেয়ে কি সাধে বলি? রিফিউজির রক্ত যাবে কোথায়? আমারও যা কপাল।”

উঠতে বসতে ইন্দুবালাকে ‘বাঙাল’ বলাটা এই বাড়ির রেওয়াজ ছিল। আর

'রিফিউজি' তো তখন কলকাতার আকাশে বাতাসে। শাশুড়িই ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে বাড়ির লোকের অভ্যেসে পরিণত হয়। মানুষকে এভাবে যে সম্বোধন করা যায় সেটা ইন্দুবালা এপারে না এলে বুঝতে পারতেন না কোনদিনও। এমনকি গায়ে পড়ে অপমানটাও। অনেক ছোট বেলায় বাড়ির মাটির দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বালিয়ে এক সময়ের টোলে পড়ানো দাদু যখন কৃতদাসদের গল্প করতেন তখন শিউরে উঠতো ইন্দুবালা। দারা দিন কাজ করতো মানুষ গুলো। নাওয়া নেই খাওয়া নেই। উঠতে বসতে মার। জাতের নামে অপমান। কাজ না পারলেই অন্ধকুঠুরিতে বন্ধ করে রাখা। এক এক সময় ছেনু মিত্তির লেনের বাড়িটা অন্ধকুঠুরি মনে হতো ইন্দুবালার। মনে পড়ে যেত সেই রাত গুলো। দাদুর গল্প বলার আসরের মাঝে ঠাম্মা এসে কড়া ধমক লাগাতো, "বাচাগুলান রাতে গুমাবে সেই খেয়াল আছে তো? থামাও তোমার হাবিজাবি গল্পগুলান।"

ইন্দুবালা রাতে স্বপ্ন দেখতেন তিনি সেই কৃষ্ণকায় দাসের মতো পিছমোড়া হয়ে বাঁধা আছেন। গায়ে লেখা কতকগুলো সংখ্যা। প্রচন্ড ভয়ে ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঠাম্মাকে পাশে খুঁজে পেতেন না। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে উঠোন পেরিয়ে ঠাম্মা তখন গোয়াল ঘরে। হরিমতির দুধ দুইছেন। তার বাছুরকে আদর করছেন। বিচালি আর ভেলি গুড় মাখিয়ে খাওয়াচ্ছেন। ঠাম্মার গা থেকে ভেসে আসছে খুলনার গন্ধ। কলাপোতার গ্রাম। চোখ বন্ধ করে আছেন ইন্দুবালা। চোখ খুললেই স্বপ্নটা যদি চলে যায়।

চোদ্দ গুষ্টি ঘটির মাঝে কেন যে তার শাশুড়ি বাঙাল মেয়ে বউ করে নিয়ে এসেছিলেন সেই সময়ে বুঝতে পারেননি ইন্দুবালা। অনেক পরে বুঝেছিলেন। কিন্তু সেদিকে গল্পের মোড় ঘোরাতে গেলে অনেকটা পথ যেতে হবে। উনুনের আঁচ হবে নিভন্ত। যা ইন্দুবালা কোনদিনই সহ্য করতে পারবেন না। তাঁর হোটেলে উনুনের আঁচ মানে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। টগবগ করে ফোটা ভাতের গন্ধ মানে এই বাড়িতে প্রান আছে এখনও। এতোদিন পরেও। বাড়িতে জমিদারি আমলের ভাড়ারে শাশুড়ি থাকা কালীন চালের অফুরান হলেও

ইন্দুবালার জীবনে প্রানের অফুরান হয়নি কখনও। বাগবাজার ঘাটে গঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনে তাঁর কপোতাক্ষের কথা মনে পড়েছিল। বাড়ি থেকে লাল চেলী পড়ে, গা ভর্তি সোনা নিয়ে চলে আসার সময় মনে পড়েছিল ইচ্ছামতীর কথা। গ্রামের পাশের বড় হালদারদের পুকুরটার কথা। সবার কথা স্মরণ করে ইন্দুবালা ছলছল চোখে গঙ্গায় ডুব দিয়েছিলেন। বিড়বিড় করে বলেছিলেন "ভালো থাকুক ইচ্ছামতী...কপোতাক্ষ...হালদারদের পুকুর"। মাস ছয়ের মধ্যে বড় ছেলে পেটে এলে গঙ্গার পাট চুকলো। শাশুড়িও অসুস্থ হলেন।

বুড়ি খিটখিটে হলেও বউয়ের নিন্দা অন্যলোকে তার সামনে করছে কোনদিন সহ্য করতে পারতেন না। তার মুখের ওপর জবাব দিতেন। ঠাম্মা শিখিয়েছিল ওপারের রান্না। আর শাশুড়ি শেখালো খুব যত্ন করে, চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় উঠিয়ে এপারের রান্না। ওপারের রান্নায় যেখানে মিষ্টতার অভাব ছিল এপারে এসে সেগুলোতে একটু একটু মিষ্টি পড়লো। আর এপারের রান্নায় মিষ্টি সরে গিয়ে কাঁচা লঙ্কা বাটা এলো। মরিচ ঝাল এলো। চুইঝালের গন্ধ এলো। মউরির ফোড়ন এলো। সারা বাড়ি মো মো করতে থাকলো ঘটি-বাঙালের রান্নার সুবাতাসে। সেদিন এমনই ভাদ্রের আকাশ ছিল। ঘর ছিল গুমোট গরম। দুই ছেলের পর মেয়েটা তখন পেটে। শাশুড়ি আর হাঁটতে পারে না। চলতে পারে না। ঘরের বিছানায় শুয়ে সব কিছু। তাও দুদিন প্রায় খাওয়া নেই। হঠাত সকালে ইন্দুবালার কাছে আবদার করলেন "বউ একটু বিউলির ডাল রাঁধলে দুটো ভাত খেতে পারতুম"। ইন্দুবালা তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে ছিলেন সেদিন। ডাল সেদ্ধ করে মৌরি ফোড়ন দিয়েছিলেন। নামানোর আগে একটুস খানি মিষ্টি। বুড়ি ওঘর থেকে চিৎকার করছিলেন হাঁপ ধরা গলায়। "হলো তোমার বউ? আর কত দেরী?" পদ্মকাটা বাটিতে ডাল ঢেলে, কাঁসার থালায় ভাত বেড়ে যত্ন করে খাইয়েছিলেন শাশুড়িকে ইন্দুবালা। সবটুকু ভাত আর ডাল বিছানার সাথে মিশিয়ে যাওয়া বুড়ি কোথায় যে নিয়ে নিচ্ছিলো ইন্দুবালা নিজেও তা বুঝতে পাচ্ছিলেন না। খাওয়া শেষ হলে বুড়ির চোখ গড়িয়ে নেমেছিল করুণাধারা। আশীর্বাদ করেছিলেন, "সবাইকে এইভাবে খাইয়ে পরিয়ে সুখী রাখিস বউ।" কথিত আছে মরা মানুষের শেষ

বচন খনার বচনের থেকেও নাকি ফলপ্রদ। সত্যি তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল ইন্দুবালার জীবনে। না হলে এতোগুলো মানুষকে এই বয়সেও খাওয়াতে পারেন? তবে যেটা তিনি এখনও বুঝতে পারেননি মানুষ কি করে বুঝতে পারে এটাই তার শেষ খাওয়া? না হলে সেই ভাত খাওয়ার পর বুড়ি আর মুখে কুটোটি নাড়েনি সারাদিন। পরের দিন সকাল বেলায় চা নিয়ে শাশুড়ির ঘুম ভাঙাতে গিয়ে শুধু দেখেছিলেন পাঁচিলের গা ঘেষা জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন বুড়ি অপলক দৃষ্টিতে। আকাশে তখন ভাদ্রের জল ভরা মেঘ। মা...মা...বলে দুবার ডেকেছিলেন ইন্দুবালা। বুড়ি আর কোনদিন সাড়া দেননি। ছেনু মিত্তির লেনের অনেক বাড়ির মতো ইতিহাস হয়ে রয়ে গিয়েছেন ইন্দুবালার মণিকোঠায়।

ধনঞ্জয় হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় আসে। হড়বড় করে বলে যায় কথা। “আমি কত বারণ করলাম। শুনুচি না আমার কথা। ওই ছেলে গুনানরে আরও মাথায় তুলুচি...। তো এমন হউচি”। ইন্দুবালা হেসে পারেন না। ধনঞ্জয়ের ভাষা ঘটি বাঙাল ওড়িয়া মিলে মিশে একাকার। মাথার চুল গুলো সব সাদা ধপধপে। কোথাও যেন ইন্দুবালার জীবনের নাড়ি নক্ষত্রের সাথে জড়িয়ে গেছে ধনঞ্জয়। তার কাছে সবটা শোনার আগে সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ পান ইন্দুবালা। কারা আসছে? এইসময় তো কোন পুজো নেই। চাঁদার বালাই হওয়ার কথা নয়। আর ছেলে ছোকরা গুলো চাঁদা চায় না তার কাছে। আবদার করে এটা ওটা নিয়ে যায়। কিম্বা দুবেলা খেয়ে যায় সবাই মিলে এসে। বড় একটা কেউ ওপরে ওঠে না নাতি-নাতনি ছাড়া। কিন্তু তাদেরও তো এখন আসার সময় নয়। কিছুদিন আগেই তো সুনয়নীকে ঠেলে পাঠালো নিজের বাবার বাড়ি। শুনছেন নাকি কোন কলেজে পড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে সে এসে পড়লেও এখন তার মোটেই আসার সময় নয়। ইন্দুবালা এগিয়ে যান দোতলার সিড়ির কাছে। সামনেই যাকে দেখতে পান সে কিংশুক। উলটো দিকের মেসে থাকে। ডাক্তারি পড়ছে। মাঝে মাঝেই রান্না খেয়ে দিদা বলে জড়িয়ে ধরে। ফরসা দেখতে। চোখে আবার গান্ধী ফ্রেমের কালো চশমা।

শহরে নতুন উঠেছে। আর চাঁদি পর্যন্ত ছাঁটা ফুলকাট চুল। আর তার ওপরটায় আবার ঢেউ খেলানো বাবড়ি। বড় মিষ্টি লাগে এমন সব আজব সাজগোজ দেখে ইন্দুবালার। ছেলেটা সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। ধনঞ্জয় তেড়ে আসে। ওপরে সে উঠতে দেবে না। হড়বড় করে বলে যাওয়া কথায় যেটুকু বোঝা যায় কিংশুক হোটেলের সামনে টাঙানো কালো বোর্ডের লেখা মুছে দিয়েছে। যেখানে রোজ রান্নার মেনু লেখা থাকে। ইন্দুবালা বলে "এতো ভারী অন্যায় কিংশুক। আমার লেখা মোছো কি কী করে?" কিংশুক তখনও হাঁপাচ্ছে। তার সদ্য তারুণ্য হার মানতে শেখার নয়। "শোনো দিদা। সত্যি বলছি। আমি তো ছিলামই না কয়েকদিন। বাড়ি গিয়েছিলাম। কাল লাস্ট ট্রেনে বর্ধমান থেকে ফিরেছি। মুড়ি জল খেয়ে শুয়ে পড়েছি...। না না প্লিজ তুমি আগে আমার কথা শোনো। আজ সকালে উঠে গিয়ে দেখি ইন্দুবালা ভাতের হোটেলে রান্না হবে কচুর ডালনা, মুসুরির ডাল, আর ট্যাঙরা মাছ? এ কেমন কথা দিদা? আজ সুজিতের জন্মদিন ও খাবে কী? এই সুজিত তুই আবার রূপম, সাবেরর পেছনে লুকোচ্ছিস কেন? এদিকে আয়।" পেছনের ছোট খাটো ভিড় ঠেলে যে ছেলেটা এগিয়ে আসে তাকে দেখে চমকে যান ইন্দুবালা। কোকড়ানো চুল। গালে হালকা দাড়ি। কালো বার্নিশে গায়ের রঙ। হাসলে টোল পড়ে গালে। চোখে শুধু চশমাটুকু নেই। এতোদিন পরে এইভাবে কেউ ফিরে আসে? সত্যি কি আসা যায়? তিনি শুধু জানেন অলোক কোনদিন ফিরবে না। ফিরতে পারে না।

বড় বেতের ঝুড়ি দিয়ে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকতো রান্নাঘরে। অনেক রাতে শহর নিশুতি হলে ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের পেছনের দরজায় কড়া পড়তো একবার। ওটা সাংকেতিক শব্দ। মানে "জেগে আছো কমরেড ইন্দুবালা?" কমরেড? সেটার আবার কি মানে? অলোক ফস করে সিগারেট জ্বালায়। "আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। তা না জেনে আমাদের খাওয়াচ্ছেন কোন সাহসে? গোটা শহর আমাদের কি বলে জানেন?" ইন্দুবালা ঘাড় নাড়েন। না জানেন না। অলোক শিড়দাঁড়া সোজা করে বলে "নকশাল"। ইন্দুবালার

চকিতে মনে পড়ে যায় আজকেই কালেক্টর অফিসের কেরানী কুল খেতে এসে কিসব ফিসফিস করে আলোচনা করছিল। কটা ছেলে মারা গেছে। গঙ্গার ঘাটে বোমা। সব নকশাল...নকশাল...। বিপ্লব করে দিন দুনিয়া পালটে দেবে। ইন্দুবালা তাকিয়ে থাকেন অলোকের দিকে। "একদিন রাতে যখন দরজা ধাক্কিয়ে ভাত খেতে এসেছিলে তখন তো জানতে চাইনি পরিচয়। আজ কেনো জানাচ্ছো? মা বলতেন অতিথির কোন পরিচয় হয় না। ধর্ম হয়না। তাঁরা হন ঈশ্বর।" চকিতে জবাব দিয়েছিল অলোক। তাকাতে পারেনি ইন্দুবালার দিকে। সে সাহস তার ছিল না। যদিও দুটো ঘোরেল পুলিশ ইন্সপেক্টর আর একটা গোয়েন্দা দপ্তরকে সে আদাজল খাইয়ে ঘোরাচ্ছে কলকাতার রাস্তায়। অলিতে গলিতে। লাল বাজারে একজন তাদেরও ওপরের লোক হাতে লোহাড় বেড়ি নিয়ে বসে আছেন নিজের সাদা-কালো আমিকে চিনিয়ে দেবার জন্য। এতোসব দস্যিপনা করা ছেলেটা সেই নিশুতি রাতে এক সহজ সরল গেঁয়ো বাঙাল বিধবার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। শুধু বিড়বিড় করেছিল "ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করিনা কমরেড। কিন্তু আপনারা থাকুন। আপনারা থাকলে আমরা থাকবো।"

অনেক রাত পর্যন্ত কান পেতে থাকতেন ইন্দুবালা। অপেক্ষা করতেন অলোকের জন্য। সারাদিন ওরা না খেয়ে, পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটে বেড়িয়ে অধিকার আদায় করছে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার। চাড্ডি ডাল ভাতের অধিকার। অপমানিত না হয়ে স্পর্ধায় মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার। তাঁরও ভাইও কি শুধু একটা ভাষার জন্য একটা দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়নি? শুনেছিলেন সেদিন ভাত খেতে এসেছিল ভাই। আর খান সেনারা গোটা বাড়িটাকে আগুনে খাইয়ে দিয়েছিল। ঠুক শব্দ শুনলেই নিজে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেন ইন্দুবালা। ছেলেটা সাতদিনের ভাত একদিনে খেয়ে কোথায় যে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চলে যেত কে জানে। মজা করে ইন্দুবালা তার একটা ছদ্ম নাম দিয়েছিলেন, প্যাঁচা। প্যাঁচার জন্য রোজ ভাত বাড়া থাকতো। কিন্তু প্যাঁচা রোজ আসতো না। তার আসা

সম্ভব ছিল না। রাতের অন্ধকারে শুধু একটা গলা ফিসফিস করে ভেসে বেড়াতো “কমরেড ইন্দুবালা আপনার থাকলে আমরা থাকবো।” কিন্তু কই। ইন্দুবালা তো আছে। তাহলে অলোক নেই কেন? সুশান্ত নেই কেনো? গোরা নেই কেনো? মাধবী নেই কেনো? প্যাঁচার দলটা যে আর ভাত খেতে আসেনি কোনদিন। বরানগর ঘাটে পিচ আর ব্লিচিং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল রক্ত। সেদিনও কি এমন বৃষ্টি পড়ছিল না? সেদিনও কি মনে হয়নি হাড়িতে আর কিছুটা চাল বেশী নিই?

কেউ যেন একটা হাত ধরে ইন্দুবালার। ছানি না পাকা ঘোলাটে চোখে সামনে তাকান। কিংশুক হাত ধরেছে। পাশে সুজিত। আরও পেছোনে ইন্দুবালার সব চাঁদপানারা। “দেখবে না দিদা তোমার বোর্ডে কি লিখেছি? তারপরে তুমি ডিসিশান নিও এই গুলো আজ রান্না করবে নাকি করবে না”। ওরা দুড়দাড় করে নামে। ইন্দুবালা কি আর অতো তড়বড় করতে পারেন? হাঁটুর ব্যাথা, গেঁটে বাত নিয়ে এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে যখন সেই কবেকার কালো সিমেন্টের বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়ান তখন তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে ভাদ্রের বৃষ্টির মতো। কবেকার অলোক, গোরা, সুশান্ত, মাধবী যেন কিংশুক, সুজিত, রূপম, সাবেরের হাত ধরে এসে লিখে গেছে তার বোর্ডে। ইন্দুবালা হোটেলের আজকের মেনুতে জ্বলজ্বল করছে ভাত, বিউলির ডাল, আলুপোস্ত, কালো জিরে দিয়ে পার্শে মাছের ঝোল, বিলাতি আমড়ার চাটনি। ইন্দুবালা জানেন এরপর তিনি আর স্বস্তিতে থাকতে পারবেন না। যতক্ষণ না ছেলেগুলোর মুখে হাপুশ হুপুশ শব্দ ওঠে। সারা বাড়ি ছড়িয়ে যায় বিউলির ডালে মৌরি ফোড়নের গন্ধে। পার্শে মাছে কালো জিরের পাশে কাঁচা লঙ্কার আবেশ করা ঝোলে। আলু পোস্তো্র একটু কাঁচা তেলের সুবাসে। বিলাতি আমরার টকে সর্ষের মন কাড়া তীব্র ঝাঁঝে। কলাপাতা পড়ে। মাটির গ্লাস। লেবু, নুন, লঙ্কা। কবেকার এক পেট ক্ষিদে আর চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের হয়ে এখনকার প্রজন্ম ভাত খায় ইন্দুবালার হোটেলে। ইন্দুবালা আজও বিশ্বাস করেন অতিথির কোন ধর্ম হয় না। বর্ন হয় না। জাত, গোত্র কিচ্ছু না। অতিথি হয় ঈশ্বর।

তিন

ছ্যাঁচড়া

কোন এক বর্ষার সকালে জন্ম হয়েছিল ইন্দুবালার। কোন এক মাঘের কুয়াশা ভরা ধান ক্ষেতের আল দিয়ে হেঁটে বাবার হাত ধরে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। শুধু এইটুক মনে আছে ফুল ফুল ছাপ একটা ফ্রক পড়েছিলেন। গায়ে ছিল মায়ের বোনা সোয়েটার। মাথায় উলের টুপি। ঠাম্মার কাছে শোনা রূপকথার রানী বলে মনে হচ্ছিল সেদিন নিজেকে। ঠাকুরদার টোলটা তখনও চলছে টিম টিম করে। সেই টোলে বর্ণপরিচয়, ধারাপাত এইসব টুকটাক শিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু বেশি দিন সেখানে পড়া হলো না। আমের গাছে মুকুল ভরিয়ে, সরস্বতী পুজোয় হাতে খড়ি দিয়ে দাদুর বড্ড তাড়াতাড়ি ছিল হয়তো এক্কেবারে চলে যাওয়ার। শিশিরে ভিজেছিল টোলের রাস্তাটা। সেদিন কেউ আর দাওয়া ঝাঁট দেয়নি। উঠোন ল্যাপেনি। পাশের মুকুল ভর্তি বুড়ো আমগাছটা কাটা হয়েছিল সৎকারের জন্য। ঠিক এর পরেই দুটো গাঁ পেরিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন ছোট্ট ইন্দুবালা। পড়াশুনোয় তাঁর বেজায় মন ছিল। দাদু স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ওই টুকুনি মেয়ে অতো কিছু বুঝতো না। শুধু অনেক দূরে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো। এক্কা-দোক্কা, লুকোচুরি, খেলনা বাটির বয়েস পার করে ইন্দুবালা প্রবেশ করলেন এবার হাইস্কুলে। সেখান মেয়ে বলতে হাতে গোনা ওই কজন। মাঝের পাড়া, পূবের গাঁ আর কোলাপোতা মিলিয়ে মেয়ের সংখ্যা তেমন একটা ছিল না। থাকবেই বা কি করে? সবাইকে স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দিতো না বাড়ির লোকজন। ছেলের পালের মধ্যে মেয়ে বসুক শুনেই হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসতো অনেকের বাড়ির লোকের। ইন্দুবালার মা'র পছন্দ ছিল না স্কুলটা। কোনদিন। বাড়িতেই তো পড়াশুনো করা যায়। অনেক বার সে কথা বলেছেন স্বামী ব্রজমোহনকে। কিন্তু যার বাবার টোল ছিল। যে নিজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কালে

পড়াশুনো করেছে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে এসে সংসারে হাত লাগিয়েছে সে তার মেয়েকে পড়াবে না তা হতে পারে? মায়ের খানিকটা চিল চিৎকারেই হোক, আর চারপাশের পরিস্থিতি দ্রুত পালটে যাওয়ার কারণেই হোক কোন এক সূত্র ধরে বাবা চিঠি লিখেছিলেন তাঁর বনগ্রামের এক বন্ধুকে। "মেয়ের বিবাহ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে চাই। ভালো পাত্র থাকলে জানিও।" সেখান থেকে উত্তর পেতে দেরী হয়নি। ছেলে একেবারে 'মাষ্টার'। নিজেদের দোতলা বাড়ি। বনেদী বংশ। বন্ধুর বিশেষ পরিচিত। শুধু একটু খুঁত আছে। খুঁত? ঠাম্মা সেদিন বাড়িতে তালের ভাপা পিঠে করেছিলেন। অষ্টম প্রহরের জন্য বাড়িতে ছিল নিরামিষ রান্না। হাড়িতে সেদিন বসেছিল আতপ চালের খিচুরী। আলু গুলো ডুমো ডুমো করে কাটা ছিল। বাগান থেকে ইন্দুবালা তুলে এনেছিলেন অসময়ের কাঁচা টমেটো। নামানোর আগে ঠাম্মা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন হরিমতির দুধে তোলা বাড়ির ঘি। কলাপাতায় খেতে বসে 'দোজবরে' শব্দটা জীবনে প্রথম শুনেছিলেন ইন্দুবালা। ছাদনা তলায় ছেলেকে দেখে ডাকাত মনে হয়েছিল। ইয়া গোঁফ, বাবড়ি চুল। চোখ লাল টকটকে। দাঁত গুলো খয়েরের ছোপে মলিন। ছেলে বরণ করে এসে এই প্রথম মা, বাবার হাত ধরে জানতে চেয়েছিলেন "সব খবর নিয়ে দিচ্ছো তো মেয়েকে? মুখ দিয়ে যে গন্ধ বেরোয়। সবাই ফিস-ফিসাচ্ছে। বলছে মাতাল বর।" কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। বাসর ঘরে কড়ি খেলা শুরু হয়ে গেছে। একটু পরেই বউয়ের পাশে নতুন স্বামী ঘুমে ঢলে পড়লে ইন্দুবালা ভালো করে তাকিয়েছিলেন লোকটার মুখের দিকে। হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলেন বাবু মাষ্টার মানিক রতন মল্লিক। নাক ডাকার চোটে বাইরে এসে বসেছিলেন ইন্দুবালা। সেই শেষবারের মতো জোনাকি গুলো যখন আলো জ্বালিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলো তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। কেঁদে ফেলেছিলেন। একটা মেয়ে তার যাবতীয় শেষ স্বপ্নটুকু নিয়ে কাঁদছে। তার সাক্ষী কোন কাছের মানুষ ছিল না সেদিন। কোনদিনই অবশ্য থাকেনি ইন্দুবালার পাশে কেউ। কিন্তু জামগাছটা ছিল। তুলসীতলা তলা ছিল। পুকুর পাড়ের কাঁচা মিঠে আমগাছটা যেন ডালপালা নেড়ে বলেছিল "কাঁদিস না ইন্দুবালা। এটা তোর

নিয়তি।”

মেয়ের হাত থেকে কণকাঞ্জলি নিয়ে মা আর ফিরে তাকাননি। এক রাতের মধ্যেই তিনি বুঝে ছিলেন কার হাতে মেয়েকে তুলে দিলেন শেষ পর্যন্ত। নিজের স্বামীকে বেশি কিছু বলতে পারেননি। এমনকি দায় চাপাতেও না। কারণ তিনি জানতেন তাঁর মেয়ে দিন-দিন একটা আগুনের গোলা তৈরী হচ্ছে। ওই রূপ এই পাড়া গাঁয়ে, খাল বিল পুকুরের পাশে, শাপলা গন্ধরাজের মতো যত ফুটে বেরোবে তত বাড়ির বিপত্তি বাড়বে। এমনিতেই রাত বিরেতে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। এগিয়ে গিয়ে দেখেন দরজার হুড়কো ভালো করে দেওয়া আছে কিনা। বাড়িতে আগুন রাখলে তার সাথে যে পর্যাপ্ত জলও রাখতে হয় সেটা মনে করেই হাত পা সিঁধিয়ে যেত তাঁর। পাশের গ্রাম থেকে মনিরুল মাঝে মাঝেই আসতো ইন্দুবালার কাছে পড়া দেখতে। এক্কেবারে পছন্দ হতো না তাঁর মার। ইন্দুবালা সেটা বুঝতেন। কিন্তু মনিরুলকে খুব মিষ্টি লাগতো। গুটি আমে সরষের তেল কাঁচা লঙ্কা চিনি মাখিয়ে খেলে যেমন মনিরুল ঠিক তেমন। লজ্জায় মুখ লাল হয়ে যায় ইন্দুবালার। এইসব কি ভাবছেন তিনি? তড়িঘড়ি বাইরের দাওয়ায় আসন পেতে, কাঁসার গ্লাসে জল দিয়ে বসতে দিতেন মনিরুলকে। এই বাড়িতে ছোঁওয়া ছুঁয়ির বাধ বিচার তেমন না থাকলেও মনিরুলের জায়গা কোনদিন বাড়ির অন্দরে হয়নি। হতোও না কোন কালে। যদিও ধর্ম-জাত এইসব নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতেন না দাদু। কিন্তু বাবা মা ছিলেন উলটো পথের পথিক। ছুত মার্গের বাছ বিচার যে কত দূর যেতে পারে তা দেখেছিলেন কলকাতায় এসে। শাশুড়ির সাংসারে। তার জীবন থেকে সবাই চলে যাবার পর ইন্দুবালা এইসব এঁটো কাটা পরিষ্কার করেছিলেন দু-হাত দিয়ে। তাঁর কাছে মানুষ মানে ছিল জীব। তিনি পেট ভরে ভাত খাইয়ে জীবে প্রেম করতেন।

মনিরুলের তখন সদ্য গোঁফ উঠেছে। কেষ্ট ঠাকুরের মতো বাঁশি বাজায়। চোখ গোল গোল করে বাতাবি লেবু গাছের তলায় চন্দ্রবোড়ার বাসার গল্প করে।

শুধু তাই নয় সুর করে মাঝে মাঝে কবিতাও বলে,

“আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে

নীরবে বসিয়া কোন কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।

মধ্যে অথই শুনো মাঠখানি ফাটলে ফাটলে ফাটি,

ফাগুনের রোদে শুকাইছে যেন কি ব্যাথারে মূক মাটি।

নিঠুর চাষীরা বুক হতে তার ধানের বসনখানি

কোন সে বিরল পল্লীর ঘরে নিয়ে গেছে হায় টানি।”

‘নক্সী কাঁথার মাঠ’-এ সাজু আর রুপাইয়ের করুণ পরিণতি বারবার যেন শুনতে চান ইন্দুবালা মনিরুলের কণ্ঠে। জসীমউদ্দিন যে তাঁর বড় ভালো লাগা কবি। চোখ ভিজে আসে তাঁর সাজু আর রূপাইয়ের দুঃখে। ঝি ঝি ডেকে ওঠে। ঠাম্মা চুপ করে সলতে পাকান। ভাইগুলো কবিতা শুনতে শুনতে হাঁ করে বসে থাকে সবে সন্ধ্যে নামা কোলাপোতার দাওয়ায়। দূরে আজানের শব্দ ভেসে আসে পাশের বাড়ির সন্ধ্যের শাঁখে। চেয়ে থাকেন ইন্দুবালা মনিরুলের দিকে। কবেকার মনিরুল তার সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে সহজ সরল টানা টানা চোখে তাকায়। আর এদিকের সত্তর ছুঁই ইন্দুবালা যেন একটুও নড়তে পারেন না বিছানা থেকে। চুপ করে শুয়ে থাকেন। উনি জানেন এই ঘোরটুকু নিয়েই এখনও বেঁচে আছেন। যেদিন এই ঘোর কেটে যাবে সেদিন তিনিও চিরকালের মতো ছেনু মিত্তির লেন ছেড়ে কোথায় কোন দূরের পথে পা বাড়াবেন। ধনঞ্জয় নীচ থেকে ডাকছে। তাকে বাজারের টাকা দিতে হবে। ফর্দ করতে হবে। কিন্তু আজ তাঁর যেন কিছুই শুনতে ইচ্ছে করছে না। কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। বর্ষার বেলা গড়াচ্ছে তিনি চুপটি করে শুয়ে আছেন। কারণ ওদিকে মা সেই সন্ধ্যে হয়ে আসা ভালোবাসার পরিবেশে শুধু শুধু তাড়া লাগাচ্ছেন। মা বুঝতে পারছেন লক্ষণ ভালো না। আগুনের গোলা হয়ে উঠছে মেয়ে। সবার চোখ তার

দিকে। এমনকি এই এক রত্তি ছেলেটারও। শেষকালে কিনা মেয়ে বিধর্মী হবে? বাড়ি থেকে পালাবে? কিম্বা পাশের গ্রামের স্বর্ণলতার মতো দেহটা ভেসে উঠবে পুকুরে? ছেলেটাকেও তো ছাড়েনি বাড়ির লোকেরা। ধান ক্ষেতে কুপিয়ে রেখে দিয়েছিল। ভাবতে পারেন না আর। মুখ দিয়ে বেড়িয়েই যায় "এবার তুই উঠে পড় মনিরুল। অনেকটা পথ যাবি। মায়েরও তো চিন্তা হয় তাই না?" কথা গুলো বলতে পেরে যেন শান্তি পান ইন্দুবালার মা। মনিরুল গুছিয়ে নেয় তার বই। ব্যাগ। হাতের বাঁশি। লণ্ঠন নিয়ে উঠোনটা পার করে দিয়ে আসেন ইন্দুবালা। দাঁড়িয়ে থাকেন বেড়ার দরজায়। যতক্ষণ না মনিরুল সামনের আলটা পেরিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়। মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছিলেন কি মনিরুলকে ইন্দুবালা? বেসেছিলেনই তো। না হলে কে লুকিয়ে লুকিয়ে মনিরুলের জন্য নাড়ু নিয়ে যেত? মুড়ির মোওয়া। আমসত্ত্ব। গপ গপ করে ছেলেটা খেত। আর এক টানা গল্প করে যেতো। কত যে গল্প ছিল মনিরুলের ওই ছেড়া কাপড়ের ব্যাগে ঠাহর করতে পারতেন না ইন্দুবালা। তাহলে কেন কোনদিন মনিরুলকে নিজের ভালোলাগা, ভালোবাসার কথা বলতে পারেননি? ভয় করেছিল তাঁর? নাকি বড় অভিমান করেছিলেন মনিরুলের ওপরে? মা আসতে বারণ করলেই কেউ আর বাড়িতে আসবে না? স্কুলে কথা বলবে না? পড়াই ছেড়ে দেবে তারজন্যে? এতোটাও কেন ভালোবাসতো মনিরুল তাকে? যে ভালোবাসার দাম দিতে গিয়ে হারিয়ে যেতে হয়েছিল। অনেকদিন পরে ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের সামনে যে ছেলেটা চশমা পরে দাঁড়িয়েছিল সে তখন আত্মগোপন করে আছে কলকাতায়। স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে একটা বড় দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সে। বালীগঞ্জের কোথাও ওরা একটা রেডিও স্টেশন খুলছে। স্বাধীন বাংলাদেশের বেতার। অনেক দিন পরে রেডিওতে বাঁশির সুর শুনে চিনতে পেরেছিলেন ইন্দুবালা। মনিরুলকে ভোলা যায় না। মনিরুল ভুলে যায়নি। কিন্তু মনিরুল সত্যি হারিয়ে গিয়েছিল একদিন চিরকালের মতো। সেতো একটা ভূবন কাঁপানো গল্প। সেদিকে এখন প্রবেশ করলে ইন্দুবালার প্রথম জীবন অধরা থেকে যাবে। সংসারটা আর যে করা হয়ে উঠবে না।

সেই যে এক ভরা বর্ষায় বিয়ে হয়ে ছেনু মিত্তির লেনের স্যাঁতসেঁতে

বাড়িটায় ঢুকলেন তারপর তো আর কোথাও যাওয়া হয়নি তাঁর। একটিবারের জন্যেও না। বাপের বাড়ি যাওয়া কঠিন ছিল। খরচ ছিল, ভিসার ব্যাপার ছিল। এক এক করে সব গয়না বিক্রি করে সংসার চালাতে গিয়ে নিজের দেহকে খালি করে ফেলেছিলেন ইন্দুবালা। মায়ের সামনে দাঁড়ালে তক্ষুনি বুঝে যাবে যে। তাই বিয়ের পর একমাত্র গঙ্গাস্নান ছাড়া আর কোথাও যাননি ইন্দুবালা। সেই যে এসে মল্লিক বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকেছিলেন আজও আছেন। কিন্তু তারজন্য কোন ক্ষেদ নেই। ভালোই আছেন। বিয়ের পরে নতুন বউকে স্বামীর বাড়িতে এসে প্রথম দিনই দেখতে হয় রান্নাঘর ভরা আছে তোলা তোলা খাবারে। ডেকচি ভরা ডাল। কড়া ভরা মাছ। হাঁড়ি ভরা ভাত। দই, মিষ্টি। পেতলের পাত্র থেকে উথলে ওঠা দুধ। চারিদিকে ভরা ভরা সব কিছু। ভরা দেখলেই তবে না গেরস্থের সংসার সব ভরে উঠবে। কোলে –কাঁখে মা ষষ্ঠী কৃপা করবেন বছরের পর বছর। "শ্বশুর বাড়িতে প্রথমে রান্নাঘরে গিয়েই হ্যাংলার মতো চোখ বড় বড় করে সব কিছু দেখো না।" পাখি পড়ানোর মতো শিখিয়ে দিয়েছিলেন মা। "যা লোভী মেয়ে একটা। হয়তো দেখা গেল রান্নাঘরে ঢুকেই শুক্তোর পাত্র নিয়ে বসে গেল। পাঁচ ভাজা থেকে নারকেল গুলো তুলে তুলে খেতে শুরু করলো। আনারসের চাটনি আর কারো জন্যে একটুও রইলো না। তখন কি বেইজ্জতিটাই না হতে হবে কুটুম বাড়িতে"। ছোট ভাই পাশ থেকে বলে "আর রসগোল্লা মা? কলকাতার ইয়া বড় বড়। সেগুলো দিদিভাই খাবে না? কিরে খাবি না?" বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন ইন্দুবালা। বয়ে গেছে তাঁর একটা অপরিচিত বাড়িতে গিয়ে শুক্তোর হাড়ি নিয়ে বসতে। নারকেল ভাজা খেতে। "কত যে আনারসের চাটনি করো? ওই তো গাছেই পচছে ফল গুলো। বয়ে গেছে... বয়ে গেছে... বয়ে গেছে"। খাবেন না ইন্দুবালা কিছু। সামনে এসে বাবা, বাছা করলেও নয়। তখন অবশ্য বুঝতে পারেননি এতোসব কিছু ইন্দুবালার কপালে জুটবে না কোনদিন। প্রথম বউ মারা যাবার ছয় মাসের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে বলে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল শ্বশুর বাড়ি। এমনকি বিয়েটাও। হঠাৎ হয়ে গেলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনটা। অথচ এইভাবে কোলাপোতায় বিয়ে হয়নি ইন্দুবালার। রীতিমতো জাঁক করে তিন গ্রামের

মানুষ খাইয়ে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন ব্রজমোহন। ঠাম্মা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। “বরযাত্রী বলতে বরের সাথে মোটে চারটে মানুষ এসেছে? পুরোহিত, নাপিত আর বরের দুই বন্ধু? ব্যাস?” বাবা বলেছিল বুঝতে পারছো না কেন মা পাসপোর্ট ভিসার খরচ নেই? ওদিকেও তো ওদের অনুষ্ঠান আছে না কি?” কিন্তু এদিকে সত্যিই কোন অনুষ্ঠান ছিল না। কোন লোকজন আসেনি। সানাই বাজেনি। একটা ন্যাড়া বাড়ি দেখে বাবার শুধু চোখ উজিয়ে জল এসেছিল। ইন্দুবালার ভাইয়ের হাত ধরে তক্ষুনি চলে গিয়েছিলেন। মেয়ের মুখের দিকেও তাকাতে পারেননি। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কি মারাত্মক ভুলটা সত্যি তিনি করে ফেলেছেন। ইন্দুবালারও তখন ইচ্ছে করছিল ছুটে চলে যাই বাবা ভাইয়ের সাথে। যেতে পারেননি। তারও অনেকদিন পরে একবার ভাই এসেছিল। তখন কলেজে পড়ছে সে। এমনি আসেনি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল বাবার মৃত্যু সংবাদ। সেবারেও যেতে পারেননি ইন্দুবালা। শাশুড়ি যে খুব অসুস্থ তখন। তারপর আর একবারের জন্যেও ভাইকে দেখেননি ইন্দুবালা। ভাই শহীদ হয়েছিল একাত্তরের যুদ্ধে। ভাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। দরজা থেকে বিদায় দিয়ে এসেছিলেন মা ঠাম্মাকে। বাবাকে বিদায় দিয়েছিলেন শ্বশুর বাড়ির দরজায়। ভাই এসে দিদিকে দেখে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেও জানে কোথায় নিয়ে যাবে তার দিদিকে? আর কিভাবে? ততদিনে যুদ্ধের দামাম বেজে গেছে। একের পর এক গ্রাম জ্বলছে। সবাইকে হারিয়ে ইন্দুবালা এখন একা। তার কোলাপোতার ভিটে বাড়ির মতো। ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের মতো। বাগানের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা নারকেল গাছটার মতো।

এখনও এইসব এতোটুকুও ভাবলে চিকচিক করে ইন্দুবালার চোখ। মনে হয় প্রেশারের ওষুধ খেতে বুঝি ভুলে গেছেন। বেতের ছোট্ট ঝাঁপি খোলেন। ওষুধ খান। ওপরের জানলা দিয়ে সকালের বাগানটাকে এই ছেনু মিত্তির লেনেও স্বপ্নের মতো মনে হয়। রান্নাঘর ভরা খাবার শাশুড়ি দেখাতে পারেননি ঠিকই। কিন্তু তাঁর দূর দৃষ্টি ছিল প্রখর। বুড়ি হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন নতুন বউকে

বাড়ির পেছনের বাগানটায়। বলেছিলেন, "চোখ ভরে দেখ বউ। কেমন উপোছাপা হয়ে আছে আমার সংসার। বেধবা মানুষ আমি। শুভকাজের ভাতের হাড়ি চাপানোর নিয়ম নেই আমার। নিজের সংসারে অমঙ্গল করতেও চাইনে। বাগান থেকে নিজের ইচ্ছে মতো যেটা মনে হয় সেটা তুলে আন গে। নিজের বউভাতের রান্নাটা যে আজ তোকেই করতে হবে।" কেমন যেন চমকে ওঠেন ইন্দুবালা। এর আগে কোলাপোতায় রান্না করেননি এমনটা নয়। জোর করে ঠাম্মা রান্না করাতো নিজের কাছে নিয়ে বসে। কখনও সখনও নিজেরও ইচ্ছে করতো। ভাইদের বলতেন "যা তো কলাপাতা কেটে নিয়ে আয়। আজ ফিস্টি হবে।" ভাইয়েরা আরও কয়েকজনকে জুটিয়ে একগাদা শুকনো খেজুরের পাতা টানতে টানতে নিয়ে চলে আসতো। খেজুরের শুকনো পাতার আঁচে ইন্দুবালা ক্ষুদ জাল দিতেন। ছোট ছোট আলু কেটে, নতুন ওঠা পেঁয়াজ কুচো করে, লঙ্কা চিরে লাল করে ভাজতেন। সবাই মিলে উঠোনে বসে যেন অমৃত খাচ্ছেন বলে মনে হতো। কিন্তু তাই বলে শ্বশুর বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই তাকে রান্না করতে হবে? এমনকি নিজের বউভাতের রান্নাটাও? এই যে বাবা বলেছিল ছেলে নাকি মাষ্টার? শিক্ষা-দীক্ষা আছে। দোতলা পাকা বাড়ি। জমিদারের বংশ। রাজ্যের চাকর-ঝি। "আমাদের ইন্দু খাটের ওপর পা তুলে বসে খাবে"। খুব একটা বেশি দিন লাগেনি নিজের শ্বশুর বাড়ির স্বরূপ চিনতে ইন্দুবালার। যে স্বামীকে 'মাষ্টার' বলে পরিচয় করানো হয়েছিল মেয়ের বাড়িতে সম্বন্ধ পাতানোর সময়। তিনি মাষ্টার ছিলেন বটে তবে তাস, পাশা, জুয়ার। চিৎপুর পাড়াতেও বেশ যাতায়াত ছিল তাঁর। রথের পরে পরেই আর ঘরে মন টিকতে চাইতো না। মুখে বলতেন পালাকার। কিন্তু আদপেই তার ধারে কাছে কোন কলম কোনদিন দেখেননি ইন্দুবালা। এমনকি এক ছত্র লিখতেও। কাজেই স্বামী মানিকরতন মল্লিক যাই বলতেন তাই যে ইন্দুবালা বিশ্বাস করে যেতেন তেমনটা নয়। কিছুটা বিদ্যে তাঁর পেটেও ছিল। শুধু প্রথম যেদিন তাঁর সামনে কাবুলীওয়ালা মানিকরতনকে পিটলো সেদিনই সব কিছু আরও পরিষ্কার হল। হেন নেশা ছিল না যা স্বামী করতেন না। এপাড়া বেপাড়ায় তাঁর ভালোবাসার মানুষের অভাব ছিল না। শুধু তারা ভালোবাসতো টাকার বিনময়ে। আর টাকা

যেত ইন্দুবালার গয়না বিক্রি করে। কাবলিওয়ালা যখন বাড়ির সামনে অমন বড় মানুষটাকে বেধড়ক জুতো খুলে মারছে কেউ এগিয়ে যায়নি। অন্য শরিকরা মুখ চাপা দিয়ে হাসাহাসি করছিল। শাশুড়ি গিয়েছিলেন গঙ্গা স্নানে। ইন্দুবালা কি করবেন বুঝতে না পেরে মাথায় ঘোমটা টেনে সটান রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। কি মনে হয়েছিল কাবলীওয়ালাটার কে জানে। মানিকরতনকে ফেলে রেখে দু দিনের নোটিস দিয়ে চলে গিয়েছিল সে। যাবার আগে বলে গিয়েছিল "এমন ছ্যাঁচড়া আদমির সাথে আছিস কি করে মা তুই"? সেদিনই মানিকরতনের অন্য নামটাও জেনে যান ইন্দুবালা। সবাই তাকে অলক্ষ্যে ছ্যাঁচড়া বলে ডাকে। দৈব্যের কি পরিহাস বিয়ের পরে প্রথম দিন শ্বশুর বাড়ির ছোট্ট বাগানে শাশুড়ি যখন ইন্দুবালাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তখন ইন্দুবালা দেখেছিলেন মাচার ওপরে পুঁইশাকের নতুন পাতা ওঠা ডগা। মাথা উঁচু করে যেন আকাশ দেখতে চায় তারা। ঝুড়ি ভরে পুইশাঁক তুলে নিয়ে এসেছিলেন মনের আনন্দে। কারণ তিনি জানতেন বাবা মেয়েকে দিয়ে যাওয়ার সময় মিষ্টি, কাপড় আরও অনেক কিছুর সাথে দিয়ে গেছেন দুটো বড় ইলিশ। ইলিশের মাথা আর পুইশাক দিয়ে জবরদস্ত ছ্যাঁচড়া রান্না করেছিলেন সেদিন ইন্দুবালা। অতোবড় ডাকাতের চেহারার স্বামী আধ কড়াই ছ্যাঁচড়া একা নিজেই সাবাড় করেছিলেন। প্রথম রাতে তাই সোহাগ উঠেছিল তার দিক থেকে মাত্রা ছাড়া। ইন্দুবালা এতো সবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যখন ঘাড়ের ওপর ওই দশাসই চেহারা চেপে বসে একটু একটু করে কৌমার্য শুষে নিচ্ছিল তখন একবারের জন্যেও মনিরুলকে মনে পড়েনি তাঁর। ব্যাথায় চোখ বন্ধ করলে উঠোনের জোনাকি গুলোকে দেখতে পেয়েছিলেন স্পষ্ট। পুকুর পাড়ের কাঁচা মিঠের আম তার ডালপালা নেড়ে ফিসফিস করে বলেছিল "নিয়তি... ইন্দুবালা...নিয়তি..."।

সামনের ভটচাজ বাড়ি থেকে গিন্নি তাঁর নাতনি রাকাকে পাঠিয়েছে। সে নাকি এবার সায়েন্স না কিসব নিয়ে পড়ছে। কলেজে ভর্তি হয়েছে। একটা সুন্দর দেখতে ট্যাব তার হাতে। ইন্দুবালা আঁচলে চশমা মোছেন। এগিয়ে আসেন

রাকার দিকে। “এক্কেবারে মায়ের মুখ বসানো”। থুতনি ধরে চুমু খান। “ভালোই হয়েছে। ভাগ্যিস শান্টুর মতো হোসনি। যা দস্যু ছিল ছেলেটা। মেয়েরা মাখের মুখ পেলে জীবনে শান্তি পায়। জানিস কি সেটা?” রাকা মাথা নাড়ে। এইসব কিছুই সে জানে না। জামশেদপুরে থাকতো। বাবা কলকাতার কলেজে ভর্তি করে দিয়ে বললো “এখানেই পড়াশুনো করো। পড়াও হবে আর দাদু-ঠাম্মাকে দেখাও”। হাসেন ইন্দুবালা। “তা ভালো। তোরা ছাড়া আর ওদের কেই বা আছে বল? তা সায়েন্স নিয়ে পড়ছিস। অতোবড় কলেজ। আমি তোকে কি পড়াবো? বল্টু মন্টুকেই আমি পড়াতে পারিনি কোনদিন। সব লোক রাখতে হয়েছিল। ইরা তো দাদাদের কাছেই পড়েছে। আমি কি শেখেবো বলতো তোকে?” আমতা আমতা করে বলেন ইন্দুবালা। এমনিতেই গাটা ম্যাজম্যাজ করছিল বলে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে। আচারের বয়াম গুলো জানলার রোদে রাখেন। মাথার ওপর কাপড়ের সাদা ঢাকা গুলোকে পাল্টান। ধনঞ্জয়কে উনুন ধরাতে বলেন। রাকা পেছন পেছন ঘুরঘুর করে। ভালো লাগে ইন্দুবালার। নিজের নাতনি গুলোর থেকেও কত ছোটো। বাড়িতে এমন একটা কেউ না থাকলে চলে? কেমন যেন ছেলে গুলোর কথা মনে পড়ে যায়। মেয়েটার কথাও। নাতি-নাতনি-নাতবউ ভরা সংসার তাঁর। কি এমন ক্ষতি হতো এই বাড়িটায় সবাই মিলে একসাথে থাকলে? ঠিক আছে। না থেকেছে ভালো হয়েছে বাবা। তারপর সেই তো কাটাকাটি, লাঠালাঠি। কম ঝক্কি পোহাতে হয়েছে এই বাড়ির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। ভাগ্যিস উনি বেঁচে থাকতে থাকতে ব্যাপারটা সেরে গিয়েছিলেন না হলে তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিতে হতো। ভালোবাসতেন কি বাবু মাষ্টার মানিকরতন মল্লিক ইন্দুবালাকে? জিজ্ঞেস করেননি কোনদিন ইন্দুবালা। স্বামীর সাথে কথা হত কতটুকু? শুধু শেষ কয়েকদিন বিছানার সাথে যখন মিশে গিয়েছিলেন নিজের মায়ের মতোই, পেটটা ফুলে উঠেছিল বেঢপ। ডাক্তার বলেছিল জল জমেছিল পেটে। অথচ মধ্যরাতে যখন জল খেতে চেয়েছিলেন, ইন্দুবালা জল গড়িয়ে দিতে এসে দেখেছিলেন সব শেষ। বাচ্চা গুলোর তখন বোঝারও বয়েস হয়নি কী ক্ষতি হল তাদের জীবনে। নাকি এই নরক থেকে চিরকালের

মুক্তিলাভ।

ইন্দুবালা রোয়াকে নেমে রান্নার বাসন গুলোকে ভালো করে জল ঝরাতে দেন। রাকা অবাক হয়ে জানতে চায় "এই এতো বাসন ইউজ হয় তোমার হোটেলে দিদা?" ইন্দুবালা হাসেন। কি আর উত্তর দেবেন ওই টুকু মেয়েকে? দোতলার ঘরে বড় কাঠের সিন্ধুকটা দেখালে তো অক্কা পাবে। সব নিজের টাকায় বানানো। হাজার লোককে এখনও এক বেলায় খাওয়াতে পারেন ইন্দুবালা। রান্না ঘরে ঢুকে উনুনের আঁচ দেখেন। রাকা যাই দেখছে তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছে " ওহ মাই গস। কয়লার উনুন? গ্যাস থাকতে এখনও তুমি এইভাবে রান্না করো দিদা? আমার কলেজে বললে সবাই এক্ষুনি ছুটে আসবে দেখতে। ইভন আমাদের ম্যামও।" ঘুরে তাকান ইন্দুবালা। "এই তো বললি কিসব সায়েন্স নিয়ে পড়ছিস তাতে উনুন দিয়ে কী হবে? আর তোর কলেজের লোকজনই বা দেখতে আসবে কেন?" রাকা হেসে ফেলে। "তুমিও দিদা। পড়ছি তো হোম সায়েন্স নিয়ে। কুকিং আমার স্পেশাল পেপার। এক্কেবারে হান্ড্রেড মার্ক্স। উইথ প্র্যাকটিকাল। তাই না তোমার কাছে এসেছি।" ইন্দুবালা এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা ঠাহর করতে পারেন। "রান্না নিয়ে পড়ছিস নাকি তুই? সেটা আগে বলবি তো বোকা মেয়ে। সায়েন্স টায়েন্স শুনে আমার তো হাত-পা ঠান্ডা"। ভটচাজ গিন্নি চালাক চতুর। ঠিক বুঝেই নাতনিকে পাঠিয়েছে ইন্দুবালার কাছে। "বই-পত্তরে, আর তোদের ওই কম্পিউটারের থেকে বেশী জানে বুড়ি। শিখে নিতে পারলে আর তোকে ঠেকায় কে।" ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের প্রথম আঁচ গনগনে হয়ে যায়। আগুনের পাশে পেতলের থালায় সিধে রাখেন। আতপ চাল। একটা গোটা পান। কাঁঠালি কলা। একটা আস্ত সুপারি। কোনদিন মিষ্টি জোটে তো ভালো। না হলে বাতাসা। এতে অগ্নিদেব খুশি হয়। গেরস্থ বাড়িতে অনুষ্ঠানে হাড়ি চাপানোর আগে রান্নার ঠাকুররা এইসব চেয়ে চিনতে নিত। এখনো হয়তো নেয়। কিন্তু ইন্দুবালা এই আচার মেনে চলেন প্রতিদিন। মানুষের মুখের অন্ন বিক্রি করেন। যা তা কথা নয়। সামর্থ যদি থাকতো সবাইকে বিনা পয়সায় খাওয়াতেন ইন্দুবালা। তেমন

খদ্দের যে নেই তা নয়। সেই লিস্টের খাতা না হয় অন্য কোনদিন খোলা যাবে। ইন্দুবালার ঠাম্মা উনুনের প্রথম আঁচে কয়লার ওপর ছড়িয়ে দিতেন অল্প করে চিনি। এতে আঁচটাও ভালো হয় আর অগ্নিদেবকে তুষ্টও করা হয়। ইন্দুবালা উনুনের পাশে ধূপ জ্বেলে দেন। উনুনের ওপর মুঠো করে ছড়িয়ে দেন চিনি। আঁচের ওপর ধক করে জ্বলে ওঠে আগুন। হাতজোড় করে প্রনাম করেন। “সবার পাতে অন্ন জুগিও ঠাকুর”। রাকা ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে দেখে। এইসব তাদের কলেজে শেখায়নি কোনদিন। তাদের তো সব মডিউলার কিচেন। আধুনিক ইকুইপমেন্ট। জল গরম করতে হলে জাস্ট টাইমার দিয়ে দাও। ইন্দুবালা বড় হাড়িতে জল বসান। দুমুখো উনুনে আর একটাতে বসান বড় লোহার কড়াই। গরম হয়ে গেলে মুগের ডাল ভাজতে থাকেন। কেমন করে ডাল আন্দাজ করতে হয়। কেমন করে জল। মাথা গুনে ভাতে চালের পরিমাপ। ইন্দুবালা শেখান রাকাকে। মনে মনে ভাবেন এইভাবে একদিন তাঁর ঠাম্মা তো তাঁকে রান্না শেখাতো। শুধু কত রকমের ফোড়ন হতো সেগুলো সব মনে রেখে দিতেন। এখনকার রাকা সেগুলো তার ট্যাবে লিখে রাখে চটপট। ছবি তোলে। ভিডিও করে। বাইরে গাড়ি এসে থামে। কেউ মা বলে ডাকে। ইন্দুবালা ঘুরে তাকান। বড় ছেলে, মেজো ছেলে তাদের বউদের নিয়ে এসেছে। যাক বাবার মারা যাবার দিনটা তাদের তাহলে মনে আছে। যদিও মনে থাকার কথা নয়। ইন্দুবালা মনে করিয়ে রাখতেন সেই ছোট্ট বেলা থেকে। রক্তকে অস্বীকার করা মানে নিজেকে অস্বীকার করা। ছেলেরা এসেছে অবশ্য তারিখটাকে লক্ষ্য করেই। বাবাকে তো তাদের মনে নেই। কিন্তু বিশেষ দিনটা মনে আছে। এই দিনে মা যে ছ্যাঁচড়াটা রান্না করে তা সারা বছর যেন মুখে লেগে থাকে।

চার

আম তেল

বিয়ের পরে সবুজ রঙের একটা ট্রেনে করে ইন্দুবালা যখন শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেছিলেন তখন তাঁর কাছে ইন্ডিয়া দেশটা নতুন। খুলনার কলাপোতা গ্রামের বাড়ির উঠোনে নিভু নিভু আঁচের সামনে ঠাম্মা, বাবার কাছে শোনা গল্পের সাথে তার ঢের অমিল। এতো বড় স্টেশন আগে কোনদিন দেখেননি ইন্দুবালা। দেখবেনটা কী করে? এই যে প্রথম ট্রেনে উঠলেন তিনি। নামলেনও। মাথার ওপর রাজপ্রাসাদের মতো ছাদ দেখলেন। এতোবড় বাড়ি দেখলেন। এতো লোক। সবাই যেন মাথা নীচু করে সামনের দিকে ছুটছে। কেউ কারো সাথে দু -দন্ড দাঁড়িয়ে একটুও কথা বলছে না। কুশল বিনিময় করছে না। যে যার খেয়ালে আছে। একটু অসতর্ক হলে, চলাফেরার একটু এদিক ওদিক হলে সবাই বুঝি সবার গায়ে হুড়মুড়িয়ে পড়বে। তখন ইন্দুবালার জিনিসপত্রের কী হবে? নেই নেই করেও তো সঙ্গের জিনিস কম নয়। মা বারবার বলে দিয়েছিল "চোখ ছাড়া করবি না ইন্দু"...। ঠাম্মা বলে দিয়েছিল "আগলে রাখবি সব কিছু"...। যদিও অদৃষ্ট বড় নির্মম খেলা খেলেছিল ইন্দুবালার জীবন নিয়ে। কোন কিছুই তিনি আগলে রাখতে পারেননি এই ভাতের হোটেলটা ছাড়া। তবুও সব কিছুর ওপর বড় মায়া তাঁর। ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্ষয়ে যাওয়া নারকেলের ঝাঁটা থেকে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি। কিছুতেই মন চায়না কোন কিছু ফেলতে। সব কিছু বুড়ি জমিয়ে জমিয়ে রাখেন নিজের করে। তাঁর উপচে পড়া স্মৃতির মতোই। মাঝে মাঝে এইসব নিয়ে যে গোল বাঁধে না তেমনটা নয়। বেশ ভালোই চিৎকার চেঁচামেচি হয়। ধনঞ্জয় তখন লোক নিয়ে এসে রেগেমেগে কিলো হিসেবে বিক্রি করে সব কিছু। বুড়ি ঘুরঘুর করে চারপাশ। "ওরে মূর্খ তুই কী করে জানবি... ঠাম্মা বলতো বাড়ির আগাছাটাও

তো দরকারি। না হলে হরিমতি খাবে কী? আর দুধ দেবেই বা কেন?” ধনঞ্জয় কাঁই মাই করে ওঠে। “বারবার তোমার খুলনার কলাপোতার গল্প শুনিও না তো মা। এখানে তোমার কোথায় হরিমতি? পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি তোমার কাছে আগাছা? এই এতো এতো ঘিয়ের খালি শিশি? রঙ চটে যাওয়া টিনের তোরঙ্গ?” টান মেরে উঠোনে ফেলেছিল ধনঞ্জয়। কেমন যেন আর্তনাদ করে উঠেছিল সেই কতদিন আগের ফুলছাপ বাক্সটা। ডালাটা হাঁ করে খুলে পড়েছিল উঠোনে। ঠিক মরে যাওয়া মানুষের মতো। তার মুখ দিয়ে কিলবিল করে বেরোচ্ছিল আরশোলা। তারাও যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম খুলনার কলাপোতার স্বপ্ন নিয়ে বংশ বিস্তার করে চলেছে। “এটা তুই কি করলি ধনঞ্জয়? এটা তোর কাছে পুরনো তোরঙ্গ বলে মনে হল?” ইন্দুবালা এগিয়ে যাচ্ছিলেন একটু একটু করে। “আমার বিয়ের সময় বাবা কিনেছিলেন ঢাকা থেকে। তারপর তিনটে নদী পার করে নিয়ে গিয়েছিলেন খুলনা। সেখান থেকে এই কলকাতা।” ধনঞ্জয় ক্ষয়ে যাওয়া নারকেল ঝাঁটায় আরশোলা মারতে মারতে বলে “তাহলেই বুঝে দেখো আর ওর জেবন প্রেদীপ থাকতে পারে?” ছ্যাঁত করে বুকে বাজে যেন ধনঞ্জয়ের কথা। তোরঙ্গের জীবন প্রদীপ নিভতে পারে তাহলে ইন্দুবালার নয় কেন? তাঁরও তো কম পথ অতিক্রম করা হলো না। এখনও কোন মায়ায় আটকে আছেন তিনি? ঘাড় তুলে আকাশের দিকে তাকান ইন্দুবালা এক টুকরো আকাশ দেখার জন্য। কিন্তু এখানে আকাশ কোথায়? ওই তো চার কোনের চৌখুপ্পি। তার ওপরে বাড়ির পেছনের আম গাছটা ঝাঁকড়া হয়ে এসে পড়েছে খানিকটা ভেতরে। কাঁচা আম গুলো যেন পুরুষ্ট হয়েছে গ্রীষ্মের রোদের খর তাপে। মন খারাপটা যেন কোথাও ঝুপ করে গায়েব হয়ে যায় ইন্দুবালার। আম দেখার আনন্দে এগিয়ে যেতে গিয়ে পায়ে কিছু একটা ঠেকে। নীচু হয়ে কুড়িয়ে নেন। সেই কবেকার প্রথম ট্রেন চড়ার টিকিট।

“বিলাতি আমড়া খাবে গো নতুন বউ? বিলাতি আমড়া?” ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়ে যায় কামড়ায়। মুখের সামনে এনে দেখায় আমড়া গুলো। ততক্ষণে

ইন্দুবালার কপালের চন্দন ফিকে হয়ে গেছে। গলায় রজনীগন্ধার মালা বাসী। চোখের কাজল কিছুটা ধেবড়ে গেছে। বাকিটা রাখা আছে বিস্ময়ে মাখামাখি হয়ে। মাথা নাড়েন ইন্দুবালা। না তিনি খাবেন না। জানলার দিকে তাকিয়ে ভাবেন এই ফল আবার কিনে খেতে হয় নাকি? তাঁদের গ্রামে ফেলা ছাড়া যেত। কাঁচা কাঁচা ডেঁসো আমড়া পেড়ে আনতো ভাই। মা চাটনি করতো। নুন দিয়ে কুটি কুটি করে কেটে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ভাই বোনে খেতো বোসদের পুকুর পাড়ে বসে। বৃষ্টির জল মেখে আমড়া পাকতো অম্বুবাচি পার করে। ঠাম্মা সারাদিন উপোষ করে থাকতো। এক বেলা ফলাহার। কখনও ছাতু ভিজে। কিম্বা সারাদিন মিছরির জল। বাবা এনে দিতেন ছানা, কলা। সেইসব মুখে তুলতেন না তিনি। সব যেত নাতি নাতনির পেটে। অতোবার চা খাওয়ার যার অভ্যেস ছিল সেও ওই কটা দিন চা না খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিত। ইন্দুবালা বিধবা হবার পর এতোসব কিছু মানেননি। তার সম্ভাবনাও ছিল না। আর লছমী থাকতে তা করতেও দিতো না। মাষ্টার রতনলাল মল্লিক তাঁকে অনেক ছোট বয়সে বিধবা করে কেটে পড়েছিলেন পরপারে। দায় ফুরিয়েছিল তার। বড় ছেলেটাও এতো ছোট তখন যে মালসার খাবার খাবে কী করে? নিজে হাতে স্বামীর মুখাগ্নি করেছিলেন ইন্দুবালা। শ্রাদ্ধও। নিয়মভঙ্গের দিন লছমীর এনে দেওয়া ট্যাঙরা মাছ আর বাড়িতে দেওয়া বড়ি দিয়ে একটা তরিজুতের ঝোল রেঁধেছিলেন। অনেক দিন পর ছোট ছোট ট্যাঙরার মাথা গুলো চুষে চিবিয়ে খাওয়ার সময় মনে পড়েছিল ঠাম্মার কথা। অম্বুবাচিতে সারাদিন উপোষ করে থাকার পর ছাতু খেতে খেতে তাঁর যখন আর কিছু মুখে রুচতো না তখন খোসা ছাড়িয়ে পাকা আমড়া মুখের কাছে ধরতেন ইন্দুবালা। ঠাম্মা চুষে চুষে সেই বুনো ফলের সব রসটুকু খেয়ে নিতো। সারা ঘর মো মো করতো পাকা আমড়ার গন্ধে। এসব কথা কোনদিন ইন্দুবালা কাউকে বলতে পারেননি। এমনকি ছেলে-মেয়েদেরকেও না। নাতি নাতনি তো অনেক দূরের কথা। কিছু কিছু জানতো মাছওয়ালী লছমী কিন্তু সেতো আজ কোন সুদূরের অতিথি।

সেদিনের সেই ট্রেনের কামড়ায় বিলাতি আমড়াই শুধু উঠেছিল তাই

নয়। চিরুনি, পাতাবাহারে ফুল গাছ, সূচ, বশীকরণের ওষুধ কৃষ্ণনগরের সর ভাজা, শান্তিপুরের ভাজা মিষ্টি সবকিছু। তার ভাই মাঝে মাঝে বায়না করে খাচ্ছিল। কিন্তু ইন্দুবালার নিজের খেতে ইচ্ছে করেনি কিচ্ছু। এমনকি নতুন জরির চুল বাঁধার ফিতে দেখেও কিনতে ইচ্ছে হয়নি। জানলার পাশ দিয়ে তখন বেরিয়ে যাচ্ছিল মাঠঘাট। নদী, নৌকা, গ্রাম। ইঞ্জিনের কয়লার কালো ধোঁওয়া। চোখ বড় বড় করে দেখছিলেন তাঁর বয়সী মেয়েরা কাজে যাচ্ছে। কলেজে যাচ্ছে। ইন্দুবালা কলেজ যেতে চেয়েছিলেন। পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হলো মনিরুলের সজল কালো চোখ দুটো বাঁধা থাকলো তাঁর অন্তরে। নক্সী কাঁথার মাঠের সাজুর মতোই তাকে সব স্মৃতি উপড়ে নিয়ে চলে আসতে হলো এপারে। রূপাই থেকে গেল অনেক দিনের পুরনো অতীত হয়ে।

ট্রেনটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কোন একটা স্টেশনে। কান ফাটানো আওয়াজ শোনা গেল বন্দুকের। ঝুপ ঝুপ করে ট্রেনের জানলা পড়তে শুরু করলো। একদল ছেলে-মেয়েকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চালালো। কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লো। মাষ্টার রতনলাল মল্লিকের ঘুম ভেঙে গেল। তিনিও বিরক্ত হয়ে ইন্দুবালার সামনের জানলা ফেলে দিলেন। গোটা কামড়ায় এক অসহ্য গুমোট গরম। বাইরে চোখ জ্বালা করা ধোঁওয়া। কানে এলো গর্জনের মতো স্লোগান "পুলিশ তুমি যতই মারো/মাইনে তোমার একশো বারো।" আবার একটা কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটলো। কামড়ার ভেতরের লোকগুলো কেমন যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। তারই মধ্যে কয়েকটা ছেলে মেয়েকে হুড়মুড়িয়ে ট্রেনের কামড়ায় উঠতে দেখলো ইন্দুবালা। ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করলো। মাথা ফেটে যে ছেলেটার রক্ত পড়ছে সে চিৎকার করে বললো, "ভয় পাবেন না বন্ধুরা...যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিনে একবেলা করে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজেদের ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের পেট ভরাচ্ছেন সেই শাসনের অবসান চাই আমরা। যে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে সেটা আর যাই হোক এই সরকার সামলাতে অপারগ...তাও আমরা যারা দুবেলা দুমুঠো এখনও খেতে পাচ্ছি...রেশনে গিয়ে পচা চাল আর

গম কিনতে পারছি তাঁরা যদি এগুলো যারা একদম পারছেন না তাদের সাহায্যে কিছু দান করেন তাহলে লোকগুলো না খেয়ে অন্তত মরবে না। কমরেড দয়া করে ভুলে যাবেন না এখনও এই দেশে একবেলাও খাবার না জোটা লোকের সংখ্যাটা অনেক।” ছেলেটা বলে চলেছিল আর কয়েকটি ছেলে মেয়ে কৌটো নাড়িয়ে অনুদান চাইছিলো। সবটাই ইন্দুবালার কাছে নতুন। একটা তারই বয়সী মেয়ে তার সামনে এসে যখন অনুদানের কৌটো ধরলো ইন্দুবালার খুব ইচ্ছে করলো তার সেই কৌটোতে দু আনা হলেও দিই। কিন্তু তার কাছে কোন পয়সা ছিল না। গা ভর্তি ছিল সোনার গয়নায়। কৌটো ধরা মেয়েটা কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ইন্দুবালার দিকে। তার বর মাষ্টার রতনলাল মল্লিক খিঁচিয়ে উঠলে সরে গিয়েছিল মেয়েটা। খারাপ লেগেছিল ইন্দুবালার। মানুষ গুলোর পেটের ভাতের জন্য ওরা রাস্তায় নেমেছে। ভিক্ষে করছে। তারা যদি দুবেলা ভরপেট খেতে পারে তাহলে যে দোরগোড়ায় এসে অভুক্ত দাঁড়াচ্ছে সে পাবে না কেন? সেই ইন্দুবালা তখনও জানতেন না তিনি একদিন একটা ভাতের হোটেলের মালিক হবেন। দুবেলায় তাঁর হোটেলে পাত পড়বে অসংখ্য মানুষের। সেই হোটেল থেকে পয়সা ছাড়াও খাবার বিলির বন্দোবস্ত থাকবে। সেটা সত্তরের জ্বালাময়ী সময়েই হোক কিম্বা তারও অনেক পরে মানুষগুলোর কাজ হারানোর সময়। সবাই জেনে গিয়েছিল এই একটা জায়গায় এমন এক অন্নপূর্ণা আছেন যাঁর ভাতের হাঁড়ি কারো জন্যেই কোনদিন খালি হয় না।

নতুন কনে ইন্দুবালার সঙ্গে মালপত্র হিসেবে ছিল বড় নক্সা করা দুটি তোরঙ্গ। দানের বাসনের বড় ঘড়াটা। বাবার হাতে ছিল ওপারের বাজারের জোড়া ইলিশ। ভাইরের হাতে দইয়ের বড় হাঁড়ি। বাবু মাষ্টার রতনলাল মল্লিকের হাতে ছিল বিয়ের ছাতা নিপাট ভাঁজ করা। কাঁধে ফেলা ছিল দানের শাল। হাতে চকচক করছিল আশীর্বাদের দু ভরি সোনার আংটিটা। স্টেশনে ট্রেন থামলে বরের বাড়ি থেকে লোক আসা দস্তুর ছিল। নতুন কনেকে যেভাবে গল্প শুনিয়েছিল তার বাড়ির লোকেরা সে আরও অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল। ব্যান্ড পার্টি। রঙ মশাল। ফানুস। কিন্তু এইসবের ছিটেফোঁটা ইন্দুবালার

আশেপাশে কিছু ছিল না। নতুন বউকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্বশুর বাড়ি থেকে কাউকে আসতে দেখেননি তিনি। বাবা একটু কুণ্ঠা নিয়েই জানতে চেয়েছিল, "বাবা রতন...তোমার বাড়ির থেকে...?" কথা শেষ করতে দেয়নি মাষ্টার রতনলাল মল্লিক। তার সযত্নে লালিত বাবরি চুলের গোছা নেড়ে বলেছিল "তাই তো...তাই তো...এখন যে কি করি? বউভাতের যোগাড় যত্নে লেগে গেল কিনা লোকজন...। পুরুষ বলতে বাড়িতে আমি তো একাই...।" বাবা বিচলিত হতে বারণ করেছিলেন জামাইকে। তিনি থাকতে চিন্তা তো কিছুই নেই। "শুধু এতো জিনিস বলে লোকজনের খোঁজ করা। তা দুটো কুলি নিলেই হয়ে যায় আর কি।" বাবা দুটো কুলির মাথায় তুলে দিয়েছিলেন প্রায় সবটুকু। আর যেটুকু ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে সবার হাতে হাতে ধরে গেল। কপোতাক্ষর গাঁয়ের মেয়ে যখন ভাগিরথীর পাড়ে এসে প্রথম পা দিলো কেউ শাখ বাজালো না। দুধে আলতা মিশিয়ে কেউ পা ছোঁওয়াতে বললো না। ঈশ্বর পাটনীর মতো কেউ আদর করে পার করে দিল না শ্বশুর বাড়ির দোড়টা। কিন্তু সে গল্প আমাদের জানা। যতই মাষ্টার রতনলাল মল্লিক বলুন না কেন বউভাতের আয়োজনে বাড়ির সবাই ব্যস্ত আছে। আমরা তো জানি ইন্দুবালার বউভাতই হয়নি। কাকপক্ষীটিও টের পায়নি ইন্দুবালার শাশুড়ি এক বংশ ঘটির মাঝে একটা বাঙাল মেয়ে বউ করে নিয়ে আসছেন। বাড়ির সামনে থেকে বাবা আর ছোট্ট ভাই চলে যাচ্ছে অপমানিত হয়ে। তাদের কেউ একটু জল খাওয়ার কথা পর্যন্ত বলছে না। যে বাবাকে এরপর আর কোনদিন দেখতে পাবেন না ইন্দুবালা। ভাই গিয়ে যোগ দেবে তারও অনেক পরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। এগুলো আমাদের গল্পের সুতো। ইন্দুবালার ভাষায় বলতে গেলে রোদে থোওয়ানো কাসুন্দি। যত তাপ পাবে...বৃষ্টি পাবে...নিজের মৌতাতে মজতে থাকবে যতনে।

কলকাতা শহর তখন বেশ স্বর গরম। মিছিলের পর মিছিল চলেছে রাস্তা জুড়ে। মানুষের পাতে ভাত নেই। মনে সুখ নেই। খাবার নিয়ে যে আন্দোলন হতে পারে ইন্দুবালা জানতেন না এই শহরে না এলে। স্টেশনের বাইরে থেকে অনেক দর দাম করে বাবা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন। সেই

ট্যাক্সির মধ্যে ইন্দুবালা, তার ভাই, বাবা আর মাষ্টার রতনলাল মল্লিক ঠিক এঁটে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল সেইসব জিনিস গুলো যা আজ ধনঞ্জয় কুড়িয়ে বাড়িয়ে ফেলে দিতে চাইছে। ও কি জানে এইগুলোর মাহাত্ম্য? গজগজ করে বুড়ি ভাঙা তোরঙ্গটার সামনে বসেন। ততক্ষণে ডালে ফোড়ন পড়েছে। নটা বাজতে চললো। কলেজের ছেলেগুলো খেতে আসবে। ইন্দুবালার কাজের তাড়া পড়ে যায়।

ট্যাক্সির জানলার পাশ আর ট্রেনের জানলার ধার ঠিক এক জিনিস নয়। ট্রেনের জানলার পাশে কত গ্রাম নদী জলা জঙ্গল আর ট্যাক্সির পাশে শুধুই ধূসর শহর। খেতে না পাওয়া মানুষের মিছিল। তখনও প্রথম ট্রেনে ওঠার ঘোরটা যেন কাটেনি ইন্দুবালার। অল্প অল্প মাথাটাও কি টলছিল ট্রেনের দুলুনির সাথে? তার রেশ রয়ে গিয়েছিল অনেক দিন। কলকাতায় এসেই মনিরুলকে লুকিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ইন্দুবালা। "জানিস মনিরুল সে যে কি ভীষণ বস্তু তোকে না বলে বোঝাতে পারবো না। আমাদের সেই বাঁশ গাছে দোল খাওয়ার মতো। তুই নিশ্চই এতোদিনে ঢাকায় পড়তে চলে গিয়েছিস? অনেক কিছু দেখা হয়ে গেছে তোর? অনেক নতুন বন্ধু হয়েছে? আমার কথা মনে পড়ে আর? বোসদের পুকুর। খানার ধারের ল্যাঙড়া...। গাজনের মাঠ...। কপোতাক্ষের ঘাট আমি কিছু ভুলিনি মনিরুল। এখনও কি নানি সন্ধ্যে হলে বিষাদসিন্ধু পড়েন? তুই কি এখনও রাতের আঁধারে বাঁশি বাজাস? লণ্ঠনের আলোয় পড়িস নক্সীকাঁথার মাঠ? ঢাকাতে কি তোর দেখা হলো আমাদের প্রিয় কবি জসীমউদ্দীনের সাথে? আমার যে সব কথা...সব কিছু বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে মনিরুল...। আমি যে তোকে...।" এরপর আর লেখা এগোতে পারেননি ইন্দুবালা। তিনি মনিরুলকে কী? ভালোবাসেন? পছন্দ করেন? একসাথে থাকতে চেয়েছিলেন? নিজের কাছে উত্তর গুলো স্পষ্ট নয়। যেমন ঠিক স্পষ্ট নয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা আদৌও হয় কিনা। কিম্বা ভালোবাসার অপর নাম শুধু শরীর কিনা। যে শরীরটাকে মাষ্টার রতনলাল মল্লিক তার ছয় বছরের বিবাহিত জীবনে তিন তিনটে বাচ্চার মা বানানোর ফ্যাক্টরি করে দিয়ে হঠাৎ

উবে যাবেন কর্পূরের মতো হাওয়ায়। শরীরের সেই না পাওয়া কিম্বা প্রচন্ড পাওয়া কষ্ট গুলো নিয়ে ইন্দুবালাকে বেঁচে থাকতে হবে দিনের পর দিন। তাও মলিন হবে না স্মৃতি গুলো। মানুষ গুলো। টগবগ করে ভাত ফোটে। ডাল ফোটে। মাছের ঝোলে মাছ গুলো যেন ফুটতে ফুটতে ফড়ফড় করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। তিন তিনটে উনুন জ্বেলে সেই স্মৃতি সম্ভাষণের আসন সাজান ইন্দুবালা।

নতুন যে দেশটায়...শহরটায় তিনি এসে পড়লেন, এই দেশ নিয়ে.. .শহর নিয়ে এর আগে তিনি কম গল্প শোনেননি। বাবার বাবা মানে ইন্দুবালার দাদু এক সময়ে নাকি কাজ করতেন কলকাতার বন্দরে। সেখানে সাহেব সুবোর খাতা লিখে তাঁর দিন গুজরান হতো। বড় বড় জাহাজে করে কত শত যে জিনিস আসতো তার কোন ইয়ত্তা ছিল না। মেমসাহেবের ছোট্ট চিরুনি থেকে বেলজিয়াম কাঁচের আয়না। ইন্দুবালার গ্রামের বাড়িতে ঠাকুর দেবতার যা মূর্তি ছিল লক্ষ্মী থেকে শুরু করে শিব সব কিছু তার দাদুর আনা। জার্মান চিনেমাটিতে বানানো সব হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। কলকাতার বড়লোক বাড়িতে ছেলে মেয়েদের খেলার জন্য বিদেশ থেকে আনাতেন বাড়ির লোকেরা। অনেক সময় বিয়ের তত্ত্ব যেতো। পুতুল গুলোর তলায় লেখা থাকতো মেড ইন জার্মানি। বেশ নামডাক ছিল এই শিল্পের। ঠাম্মার খেলার জন্য দাদু এইসব পুতুল মাঝে মাঝে নিয়ে গেলেও ঠাম্মা সব কিছু সাজিয়ে রাখতো পুজোর ঘরে। লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিয়ে কেউ খেলে নাকি? শুক্রবার হলেই দাদু বাড়ি ফিরতো শিয়ালদহ স্টেশন হয়ে খুলনায়। একটা সবজেটে ট্রেন দাদুকে নামিয়ে দিত কপোতাক্ষের ওপারে। শনি রবি বাড়ি থেকে আবার সকালের ট্রেন ধরে কলকাতায়। বাবাও দাদুকে অনুসরণ করেছিলেন। দাদুর কাছে কাজ শিখতে শিখতে কলকাতায় পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মাঝখান থেকে দেশটা স্বাধীন হলো। শুধু স্বাধীন হলো তাই না দেশটা দু-টুকরো হলো। মনে অনেক কষ্ট আর হতাশা নিয়ে দাদুর সাথে বাবা ফিরে এলেন খুলনার কলাপোতায়। যা টাকা জমিয়েছিলেন দাদু সেই টাকায় কিছু জমি কিনলেন। একটা টোল খুললেন। সেখানে পড়াতে শুরু

করলেন গ্রামের ছেলে মেয়েদের। বাবা জমি জমার কাজ নিয়ে পড়ে থাকলেন। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর দাদুর কলকাতার অনেক বন্ধু বান্ধব তাকে বারবার বলেছিল ইন্ডিয়াতে থেকে যেতে। দাদু রাজী হননি। যে গ্রামের মাটিতে তাঁর বাবা, মা, পূর্বপুরুষেরা পঞ্চভূতে বিলিন হয়েছেন সেখানেই তিনিও থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর অবিচল সিদ্ধান্ত থেকে কেউ টলাতে পারেনি। তাহলে যেখানে সবাই রয়ে গেল ওই পাড়ে, সেখানে একমাত্র ইন্দুবালা তাঁদের পিতৃপুরুষের স্মৃতি তর্পনের জন্য কেন রয়ে গেলেন এপাড়ে? কেন বাবার মনে হয়েছিল একমাত্র ইন্দুবালাকেই ওপারে পাঠাতে হবে? অনেকের মতো কেন তিনি নিজেও সিদ্ধান্ত নিলেন না এপারে চলে আসার? ইন্দুবালা জানতেন বাবা শিকড় ছাড়া হতে পারতেন না। মাও না। ঠাম্মাও না। আর ভাই? তার কথা সোনার আখরে ইতিহাসে না লেখা থাকলেও ইন্দুবালা জানেন ওই যে মুক্তোর মতো বর্ণপরিচয় সেখানেই লুকিয়ে আছে তাঁর ভাই। লুকিয়ে আছে বাংলা ভাষার রাষ্ট্র গড়ার দাবীতে।

গোটা বাড়ির জানলা দরজা গুলো হুটোপাটি করে পড়ার শব্দে ইন্দুবালার ঘুম ভেঙে যায়। দুপুরের হোটলের কাজ কম্ম শেষ করে তাঁকে এখন একটু গড়িয়ে নিতে হয়। না হলে রাতের দিকে আর উনুনের সামনে দাঁড়াতে পারেন না। কাঁচা ঘুম চোখে তাকান ইন্দুবালা বাইরের দিকে। আকাশ কালো করে মেঘ করেছে। কালবৈশাখী। কোনরকমে গাঁটের ব্যাথা সামলে উঠে পড়েন তিনি। ধনা...ধনা করে চিৎকার করেও ধনঞ্জয়ের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। বাজার করতে গেল নাকি এখনি? ইন্দুবালা কোন রকমে ওপরের ঘরের জানলা গুলো বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন আর ঠিক তখনি তাঁর নজর গেলো উঠোনে। বাগানের গাছটা থেকে টুপ টুপ করে আম পড়ছে ঝড়ে। সেদিনও কি এমন ঝড়টাই হচ্ছিল না? তবে সেটা ছিল ভোর। আর আজ বিকেল। ইন্দুবালা নামতে থাকেন সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু তাঁর মন যেন ছুটছে।

ছুটছেন ইন্দুবালা। ছুটছেন তীর বেগে। হাতে লণ্ঠন। ভোর হতে তখন

অনেক দেরী। পেছনে ছুটছে ছোট্ট ভাইটা। তার পেছনে মা তারও অনেক পেছনে ঠাম্মা। গোটা আমবাগান জুড়ে কলাপোতার লোকজন যেন জড়ো হয়েছে ওই আঁধার ভোরে। প্রায় একশো গাছের বাগান যাদের তারাও এসে জড়ো হয়েছে। শিলের মতো পড়ছে আম। কেউ মারামারি করছে না। রেষারেষি না। সবার কোচড় ভরে উঠছে কাঁচা মিঠে, ল্যাঙড়া, বোম্বাই আমে। ঝড়ের সাথে শুরু হচ্ছে বৃষ্টি। কড়কড় করে বাজ পড়ছে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইটা ঠকঠক করে কাঁপছে। ছুটে গিয়ে নিজের আঁচলে জড়িয়ে ধরেম ইন্দুবালা। "লেবু পাতায় করম চা যা বৃষ্টি চলে যা"। কিন্তু বৃষ্টি থামার নাম নেই। গায়ে যেন বরফ জলের ঠান্ডা। ভাই বোন ঠকঠক করে কাঁপে। দুজনে আগলে রাখে কোচড়ে জমানো আম গুলোকে। একটা সময়ে ইন্দুবালা হঠাৎই বুঝতে পারেন চারপাশে বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু তাঁদের মাথায় বৃষ্টি নেই কেন? ওপর দিকে তাকাতে ইন্দুবালা দেখলেন একটা বড় কচু পাতা। সেটা ধরে আছে মনিরুল। কি যে ভালো লেগেছিল সেদিন ইন্দুবালার বলে বোঝাতে পারেননি কাউকে। বলার সুযোগ ছিল না। কম কথা বলা মেয়েটা রুমালের ওপর সুতো দিয়ে একটা ছেলেকে এঁকেছিল। তার হাতে দিয়েছিল একটা কচুর পাতা। আর মেয়েটাকে রেখেছিল দূরে। এলোচুলে। বৃষ্টির মধ্যে। ইচ্ছে ছিল মনিরুলকে নিজে হাতে করে দেবে। সেটা আর দেওয়া হয়নি। জ্বর বেধেছিল সেবার খুব। সাতদিনের মাথায় পথ্যি পেয়ে তবে মেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল। গ্রীষ্মের রোদে ঘর থেকে বেরিয়ে মন ভালো হয়ে গিয়েছিল ইন্দুবালার। ঠাম্মা সেই ঝড়ে কুড়োনো আম গুলোকে দিয়ে আমতেল বসিয়েছেন রোদে। সূর্যিদেব গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে রোদে তাতিয়ে তেলে মিশিয়ে কাঁচা আম গুলোকে জারিয়ে দেবেন নকুলের ঘানির খাঁটি সর্ষের তেলে। তারপর সেই তেল দিয়ে সারা বছর যা খাওয়া দাওয়া চলবে তার কোন হিসেবের কুল কিনারা পাওয়া যাবে না। আম তেল মুড়ি দিয়ে মাখা হবে। গরমভাতে ঘিয়ের বদলে খাওয়া হবে। মাছের ঝোলে বিশেষ করে সরল পুটিতে আমের গন্ধ দেওয়ার জন্য আমতেল ব্যবহার হবে। আর গ্রামে পোয়াতির সংখ্যা নেহাত কম থাকে না সম্বৎসর। তারাও পাবে। পাতা কুড়োতে এসে খেন্তির মা পাবে। টিফিনে

মনিরুল পাবে। ফকিরি গান করতে আসা ভিখারী পাবে। চুরি করে ঠাম্মার আম তেল খেতে খেতে গরমের ছুটির দুপুর গুলো কেটে যাবে।

বৃষ্টিটা সবে থেমেছে। ইদানিং হয়েছে কি কলকাতার এই ধরনের হুট করে বৃষ্টিতে সবাই কেমন যেন তালকানা হয়ে যায়। ট্রাফিক সার্জেন্ট থেকে শুরু করে অটো চালক সবাই। প্রদীপ নিজেই ড্রাইভ করে মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু গাড়ি পার্ক করবে কোথায়? ইন্দুবালার ভাতের হোটেলের সামনে একটু বৃষ্টিতেই গোড়ালি সমান জল। সেখানে আবার কোথায় গর্ত আছে, নর্দমা আছে সেইসব দেখে গাড়ি পার্ক করতে প্রদীপের অনেকটা সময় লেগে যায়। এতোক্ষণে বাড়িটার দিকে তাকানোর সময় হয় তার। আর বাড়িটার দিকে তাকাতেই কেমন যেন কু গেয়ে ওঠে মনটা। গোটা বাড়িজুড়ে অন্ধকার। কেউ কোত্থাও নেই। এমনকি সামনের বোর্ডে লাগানো আলোটাও আজ জ্বলছে না। প্রদীপ অনেক দিন পর মায়ের সাথে দেখা করতে এলো। আসবো আসবো করে তার আসাই হয় না। আজ এইটা কাল ওইটা লেগেই থাকে। আজকে আসার আরও একটা কারণ হচ্ছে এইবার পাসপোর্টটা ফারদার রিনিউ করার আগে সে একবার বাংলাদেশ ট্যুর করতে চায়। একটা প্যাকেজেও পাচ্ছে প্রায় কিছু না দিয়েই। ছেলে বুবাই বললো, "যাও না ঠাম্মির দেশে। কিসব তোমাদের কলাপোতা...ফোতা।"

আইডিয়াটা খারাপ লাগেনি প্রদীপের। বউ সম্পূর্ণাও রাজী হয়ে গিয়েছিল। কর্মসূত্রে স্বামীর সাথে তার বাইরের অনেক দেশ ঘোরা। কিন্তু বাংলাদেশ যাওয়া হয়নি। নিজের চোখে হাতে করে একটু ঢাকাই মসলিন দেখে আসার ইচ্ছে আছে তার। সাথে কিছু কেনারও। এবার মা রাজী হলে তাহলে পাসপোর্টের একটা ঝামেলা থাকবে। মায়ের পুরনো পাসপোর্টটা আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার। প্রদীপ যদিও জানে পাসপোর্ট করাতে সময় লাগবে না। বুবাইয়ের বন্ধু কাজ করে ফরেন সার্ভিসে। তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সব। সম্পূর্ণাই তাকে ঠেলে পাঠালো। একবার কথা তোলবার জন্য। মেজাজ যা মাঝে মাঝে থাকে বুড়ির। বাড়ি থেকে যখন বেড়িয়েছিল প্রদীপ বৃষ্টি ছিল না। এই দিকেই

হয়েছে তাহলে ভালো। প্রদীপ এগিয়ে গেল ভেতরের দরজার দিকে। সিঁড়ির আলো জ্বালালো। বাইরের বারান্দার। না কোথাও কেউ নেই। দুবার ডাকলো মা মা বলে। উত্তর এলো না। প্রদীপ চিৎকার করে ডাকলো ধনঞ্জয়কে। ধনঞ্জয় নেই। কেমন যেন ভয়ে পেয়ে গেলো প্রদীপ। যদি মা সত্যি না থাকে? এই কথাটা এই প্রথম ভাবলো যেন সিনিয়র সিটিজেনের ক্যাটাগরিতে সবে প্রবেশ করতে যাওয়া প্রদীপ। এমন ভাবে কোনদিন এর আগে মনে হয়নি। মা থাকলে জগৎটা তার এক রকম। আর মা না থাকলে আর এক রকম। বাবাকে তার ঝাপসা মনে পড়ে। ঘুড়ি ওড়ালে বাবা লাটাই ধরা শেখাতো। ব্যস ওইটুকুই। তার তো তাও এটা মনে আছে ভাই আর বোনের সেটুকুও তো মনে নেই। সবটাই তো তিনজনের মাকে ঘিরে। একবার কি ফোন করবে তাহলে ভাইকে? খুকুকে? কিন্তু কী বলবে? ছেনু মিত্তির লেনে ইন্দুবালা ভাতের হোটেলে সে এসেছে অথচ ইন্দুবালাকে খুঁজে পাচ্ছে না? বাইরের দিকে পাতকো তলায় উঠোনের কাছে এসে আর একবার কাঁপা কাঁপা গলায় ডেকে উঠলো প্রদীপ... "মা"। এবার খুব শান্ত গলায় উত্তর ভেসে এলো "আয়..."। প্রদীপ তার মায়ের গলা শুনতে পেল কিন্তু মাকে সে দেখতে পেলো না তখনি। মোবাইলের টর্চ জ্বালালো। "কোথায় তুমি মা?" আর অবাক হয়ে দেখলো তার মাকে। কাক ভিজে হয়ে সন্ধ্যের উঠোনে ঝাঁকড়া আমগাছের ডালটার নীচে বসে আছেন ইন্দুবালা। চারপাশে জড়ো করা ঝড়ে পড়া কাঁচা আম। প্রদীপ এগিয়ে যায়। জড়িয়ে ধরে তার মাকে। "মা তুমি ঠিক আছো তো? তোমার শরীর ঠিক আছে তো? পড়ে গিয়েছিলে নাকি? এই বয়সে কেউ এভাবে এতো বৃষ্টির মধ্যে...। আমাকে ধরো মা...প্লিজ আমাকে ধরো...শক্ত করে ধরো...।" ইন্দুবালা ছেলের হাত ধরেন। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে, আধুনিক মোবাইলের এল ই ডি লাইটে ইন্দুবালা বলে ওঠেন "আমাকে একটু তেল কিনে দিবি খোকা? আম তেল বানাবো...।"

এমনটা নয় যে ইন্দুবালার তেল কেনার টাকা নেই। এমনটা নয় ইন্দুবালা এইভাবে ছেলেদের কাছে টাকা চান। কোনদিন কারো কাছে একটা টাকাও

হাত পেতে চাননি সেই প্রথম দিন লছমী টাকা দিয়ে ভাত খেয়ে যাওয়ার পর। তারপর থেকে ক্যাশবাক্স ভর্তি থেকেছে সবসময়। তাই প্রদীপ একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তার মনে ভয় ছিল ছোট খাটো কোন সেরিব্রাল এ্যাটাক হয়েছে কিনা। ততক্ষণে সারা রাজ্যের বাজার ঘুরে ধনঞ্জয় এসে গিয়েছিল। প্রদীপ একটুও দেরী না করে এ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিল। সোজা নিয়ে গিয়েছিল হসপিটালে। এমার্জেন্সির ডাক্তার বরং উলটে কথা শোনালো প্রদীপকে। আমতেল করবেন বলে তেল কিনে দিতে বলেছেন বলে সোজা হসপিটাল নিয়ে চলে এলেন? আচ্ছা ছেলে তো মশাই। প্রদীপ কিছুতেই বোঝাতে চেষ্টা করলো না এই ইন্দুবালা কি ধরনের মানুষ। বরং ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন দু বেলা এখনও তিনশো লোকের রান্না করা, কুটনো কাটা ইন্দুবালা করেন কী করে? আতিপাতি খোঁজ নিয়ে হোটেলের ঠিকানা নিয়ে দুটো এন্টাসিড লিখে ডাক্তার ছেড়ে দিলেন ইন্দুবালাকে। তার সাথে ইন্দুবালা তাকে বলে এলেন সকালে উঠে লেবুর জলের সাথে মধু খাওয়ার নিদান। তাও যে সে মধু নয়। সর্ষে ফুলের মধু। গরম জলের মধ্যে ঘুরবে তার ঝাঁঝ। আপনি চর্বি যাবে কমে।

ইন্দুবালার শরীর যখন বেশ ভালো। তেলের মধ্যে আমগুলো যখন বেশ চুবো চুবো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রদীপ তার বউকে নিয়ে এলো একদিন। সেদিন যে কথাটা পাড়া হয়নি এবার বলেই ফেললো সাহস করে। "যাবে মা আমাদের সাথে বাংলাদেশ?" ইন্দুবালা খুব যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন তেমনটা নয়। এঁচোড় কাটছিলেন হাতে তেল মেখে আঠা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। কুটনো কাটা থেমে গেল তাঁর। বিয়ের পরে যখন দেশ থেকে এসেছিলেন তখন সেটা ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আর আজ সেটা বাংলাদেশ। তার ছেলে বলছে মাকে একবার বাংলাদেশ ঘোরাবে। সত্যি কানে ঠিক শুনছেন তো তিনি? কোন ছলনায় এরা আবার এসে জোটেনি তো এই সাত সকালে? উঠে পড়েন ইন্দুবালা। পড়ে থাকে আধ কাটা এঁচোড়। ডালনার না কাটা আলু। মোচা। আরও অনেক তরিতরকারি। ছেলের কাছে এগিয়ে এসে জানতে চান হঠাৎ বাংলাদেশ যাওয়ার কথা বলছিস কেন? আমি না মরা পর্যন্ত এই বাড়ি তোমরা বিক্রি করতে পারবে না খোকা। প্রদীপ হো হো করে হাসে। "তুমি কি

করে ভাবলে আমি বাড়ি বিক্রি করার জন্য তোমাকে বাংলাদেশের লোভ দেখাবো?” ইন্দুবালা বিশ্বাস করেন না তাঁর ছেলে মেয়েদের। “এই তো সামনের চক্কোত্তিবাড়ির মেয়ে দুটো বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি বিক্রি করে ফ্ল্যাট তুলে দিলো।” সম্পূর্ণা এবার এগিয়ে আসে। ইন্দুবালার বড়ছেলের বউ কম কথা বলে। কিন্তু যেটুকু বলে কাটা কাটা, তীক্ষ্ণ, নুন ছড়ানোর মতো। “আপনি ভুল বুঝছেন মা। চক্কোত্তি বাড়ির সাথে আপনার ছেলে মেয়েদের গোলাবেন না। আমরা বাংলাদেশের ট্যুর প্ল্যান করছিলাম। প্রদীপ তাই ভেবেছিল আপনি গেলে আমাদের ভালো লাগবে। ও তো কোনদিন দেখেনি...। কলকাতা স্টেশন থেকে এখন ট্রেনও ছাড়ছে। মৈত্রী এক্সপ্রেস। এর মধ্যে বাড়ি বিক্রির কথা আসছে কী করে? আর আমাদের সবার তো বাড়ি আছে মা...।” ট্রেন ছাড়ছে বাংলাদেশের জন্য এই বড় খবরটা ইন্দুবালার কাছে ছিল না এতোদিন? “ট্রেনে করে যাওয়া যাবে খুলনা?” বড় ছেলে বলে যাবে। ইন্দুবালা প্রশ্ন করেন “জানলার ধারে সিট পাবো খোকা?” প্রদীপ জানিয়ে দেয় “পাবে। আমরা একটা কূপ রিজার্ভেশান করে নেবো মা। সেখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ থাকবে না।” কেমন যেন ফুরফুরে মেজাজের হয়ে যান ইন্দুবালা। বাড়ির সামনের তুলসী মঞ্চটাকে স্পষ্ট দেখতে পান। মাকে...বাবাকে...ঠাম্মাকে...ভাইকে...মনিরুলকে...।

বড় ছেলে, বউকে এঁচোড়ের ডালনা, মোচার ঘন্ট, পাবদার ঝোল আর কাঁচা আমের চাটনি খাইয়ে বাড়ি পাঠান। ভাত খেতে আসা কালেক্টর অফিসের কেরানি থেকে শুরু করে সামনের মেসের ছেলে গুলো এমনকি পাঁচু পাগোলও জেনে যায় ট্রেনে করে ইন্দুবালা বাংলাদেশ যাবেন। সারা রাত ওপরের ঘরে ঘটর ঘটর করে কিসের যেন আওয়াজ হয়। ধনঞ্জয় যতক্ষণ জেগেছিল শুনেছে। অনেক ভোরে ইন্দুবালার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায় তার। “কি হয়েছে মা? এতো ভোরে?” চোখ কচলায় ধনঞ্জয়। দেখে ইন্দুবালার পরিপাটি করে চুল বাঁধা। নতুন কাপড় পড়া। কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি। “কী হলো কি মা তোমার? নাতি পাসপোর্টের ফটো তোলার জন্য তোমাকে নিয়ে যাবে বেলা নটায়। এখন

থেকে কাপড় পড়ে বসে আছো কেন?" ইন্দুবালা হুকুমের সুরে বলে একটা ট্যাক্সি ডাক। আমি কলকাতা স্টেশন যাবো। ধনঞ্জয় বলে "এ্যাঁ? এতো সকালে কলকাতা স্টেশনে? তোমার মাথা কি সত্যিই খারাপ হলো?" ইন্দুবালা কোন কথা না বলে দরজার দিকে এগোলে কোনরকমে উঠে জামা পড়ে দৌড় লাগায় ধনঞ্জয়। এই মুড তার অনেক দিনের চেনা। বেশি কথা বললে জেদ আরও বাড়বে। নিজেও চলে যেতে পারে। তখন হিতে বিপরীত হবে। দাদাবাবুদের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান কাবার হবার জোগাড়। তাই কথা না বাড়িয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিজেও চেপে বসে ধনঞ্জয়।

দুটো প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটা হয়। ইন্দুবালা বলেন "জিজ্ঞেস কর মৈত্রী এক্সপ্রেস কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে?" একজন টিটি দেখিয়ে দেয়। "ওই তো...দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওদিকে তো যেতে পারবেন না। সময় হয়নি এখনও। টিকিট আছে তো? পাসপোর্ট ভিসা চেক হবে।" দূর থেকে মৈত্রী এক্সপ্রেস দেখেন ইন্দুবালা। বড় বড় করে বোর্ডে লেখা কলকাতা-খুলনা। কিন্তু সেই আগের ট্রেনটার মতো সবজেটে নয়তো। কেমন যেন ধূসর নীল। "আচ্ছা আপনি ঠিক বলছেন তো ভাই? এই ট্রেনটাই যাবে খুলনা?" ইন্দুবালা এবার নিজে জানতে চান। বিরক্ত হয় টিটি। একে ইণ্টারন্যাশানাল ট্রেন। তার ওপরে ঝক্কি আছে অনেক। "দেখতেই তো পাচ্ছেন লেখা আছে সব কিছু।" কিন্তু এই ট্রেনের সামনে তো শেষবারের মতো মনিরুলের সঙ্গে দেখা হয়নি ইন্দুবালার। দুই দেশের মধ্যে যখন সব যোগাযোগ বন্ধ তখন সেই সবজেটে ট্রেনটাই কি একটা থেমে থাকা সময়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো না শিয়ালদার স্টেশনে? মাঝে মাঝে লছমীর সাথে শুধু সেই ট্রেনটাকে দেখবেন বলে চলে আসতেন ইন্দুবালা। সেই ট্রেনের গায়ে হাত দিলে তিনি তার দেশকে দেখতে পেতেন। গ্রামটাকে দেখতে পেতেন। গন্ধ পেতেন কপোতাক্ষের। না না না...এই ট্রেন তাঁর সেই সবুজ কাঁচা আমতেল রঙের ট্রেন নয়। এই ট্রেন কী করে যাবে খুলনা? বসে পড়েন ইন্দুবালা। চোখ দিয়ে টিপ টিপ করে বৃষ্টির মতো পড়তে থাকে জল। অনেক দিন আগে একাত্তরে তাঁদের কলাপোতার বাড়িটা পুড়িয়ে

দিয়েছিল খানসেনারা। বাড়ির সাথে পুড়েছিল মা, ভাই আরও অনেকে। বাড়িটাকে পাওয়া যাবে না তিনি নিশ্চিত জানেন। এবার যদি গিয়ে গ্রামটাকেই না খুঁজে পান? যদি বোস পুকুরটাই আর না থাকে? কপোতাক্ষের ঘাট। মনিরুলের বাড়ির উঠোন? বড় খেলার মাঠের ফলসা গাছ? তাহলে কার কাছে ফিরে যাচ্ছেন ইন্দুবালা? কার কাছে? যারা ছিল আজ নেই...? নাকি যারা মরেও বেঁচে আছেন ইন্দুবালার মধ্যে? নীরবে কাঁদেন ইন্দুবালা। কিন্তু কান্নাটাও বা কার জন্যে? কোন সদুত্তর পান না নিজের থেকে। শুধু এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার মানুষদের ভিড় বাড়ে। তাঁরা দেখেন সত্তর পেরোনো এক মহিলা চুপ করে বসে আছেন দেশে ফিরবো বলে। যার সত্যি আজ দেশে ফেরার পথে অপেক্ষা করে থাকার কেউ নেই।

পাঁচ

মালপোয়া

ভোর থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার অনেক আগেই। অন্ধকার ঘরটায় শুয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছিলেন ইন্দুবালা। অল্প অল্প বাতাসে দুলছিল জানলার হালকা পর্দা গুলো। তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল একটু একটু করে ফর্সা হতে থাকা আকাশটা। একতলায় ভাতের হোটেলের ওপরে তাঁর ঘরটা ছোট্ট হলেও বেশ খোলামেলা। অন্তত এই বাড়ির অন্য ঘর গুলোর থেকে। ঘরের চারিদিক বরাবর বেশ কয়েকটা জানলা। সামনের দিকে এগিয়ে গেলে ছেনু মিত্তর লেন। হরেক মানুষ, গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াত। আর পেছন দিকটা শাশুড়ির আমলের ছোট্ট বাগান। সিড়িঙ্গে নারকেলগাছ। ঘোষদের ডোবার পাশে একটা ঝাকড়া তালগাছ। উঠোনের আমগাছের ডালপালা আরও কয়েকটা জানলায় ছড়ানো ছিটানো। এই ঘরটা আসলে ছিল ইন্দুবালার স্বামী মাষ্টার রতনলাল মল্লিকের আমোদের জায়গা। তিনি তাঁর ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে এসে এই ঘরেই জোটাতেন। দিন রাত তাস পেটা চলতো। তার সাথে গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি আর সোডা। ঘর খানায় ঢুকলে মনে হতো কেউ যেন সক্কালের আঁচ ধরিয়েছে। ঝাঁট দিয়ে জড়ো হতো রাশীকৃত পোড়া সিগারেট আর তার প্যাকেট। শাশুড়ি উঠতে বসতে খোঁটা দিতো বউয়ের গতর নিয়ে। যে গতরে তাঁর বাহির মুখো ছেলে অন্দরে মন বসাতে পারলো না। অথচ নাতি নাতনির অভাব হলো না মোটেও। তিন তিনটে সন্তানকে রেখে মাষ্টার রতনলাল মল্লিক যখন ইহ জীবনের মায়া ত্যাগ করলেন তখন ইন্দুবালা ভেতরের ঘর থেকে বাইরের এই ঘরে এসে থাকতে শুরু করলেন। শুধু কি অনেক আলো হাওয়া বাতাসের জন্য? না তা মোটেই না। এই ঘরে থাকলে তিনি নীচের হোটেলের রান্নাঘর থেকে ছোট ছোট ছেলে

মেয়েদের উপস্থিতি টের পেতেন। সিঁড়ির মুখ থেকে এই ঘরের দিকে নজর দেওয়া যেতো খুব সহজে। আর এই ঘরটায় এলেই যেন ইন্দুবালার কোলাপোতার বাড়ির দাওয়াখানা মনে পড়ে যেত। চারিদিকে সবুজের চাঁদোয়া।

ইন্দুবালা পাশ ফিরলেন।

এই এতো বয়সেও স্মৃতি গুলো কেন এলোমেলো হয়ে যায় না? ভুলেও তো যেতে পারে মানুষ অনেক কিছু? নিয়তিকে দোহাই দেন ইন্দুবালা। হয় ভুলিয়ে দাও। না হলে ভুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। অদৃষ্টকে সাত গাল পাড়লেও অনেক কিছু ভোলা হয়না ইন্দুবালার। ভাগ্যিস ভোলা হয় না। তাই তো আনাজের চুবড়ি থেকে। সূচ সুতোর কৌটো থেকে। ভাতের হাড়ির সুবাস থেকে বেরিয়ে আসে কত কত গল্প। ইন্দুবালা চোখ বন্ধ করে আবার একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করলেন। ঠাম্মা সন্ধ্যেবেলায় আফিম খেতো। ছোট ছোট কালো কালো গুলি করা থাকতো কৌটোতে। বাবা খুলনা শহরের বড় এক আড়তদারের কাছ থেকে নিয়ে আসতো। ফুরিয়ে আসতে থাকলেই ঠাম্মার মাথা যেত খারাপ হয়ে। একটানা আবদার চলতো তার। ধুয়ো টেনে টেনে ঠাম্মা বলে চলতো, ও হরি...নিয়ে আয় না বাবা। শেষ হয়ে গেল যে গুলি। সেই কাতর চাহনি এখনও যেন মনে পড়ে ইন্দুবালার। ঠিক মরে যাওয়া মানুষের সাথে তার কি কোন মিল ছিল? ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকটা। শাশুড়ির কথা মনে পড়ে। স্বামীর কথাও। মৃত মানুষের চাহনি ইন্দুবালাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

মুকুলে ভরা আম গাছের তলায় শোয়ানো হয়েছিল দাদুকে। ইন্দুবালা তখন খুব ছোট। কিছুক্ষণ আগে ঠাম্মা ভাজছিল দাওয়া আলো করে নতুন গুড়ের মালপোয়া। গোটা গ্রামে যেন ছড়িয়ে পড়েছিল গন্ধ। তেলের ছ্যাঁক ছুক আওয়াজে উমনো ঝুমনোর পিঠে খাওয়ার গল্পটা আগাগোড়া বলে চলেছিল ঠাম্মা। হাঁ করে বসে শুনছিল ছোট্ট ইন্দুবালা। দাদু স্নান করতে যাচ্ছিল বোসদের পুকুরে। বাবা গিয়েছিল ধান বিক্রি করতে হাটে। মা ছিল শোওয়া।

ভাই তখন পেটে। দাদুর ইচ্ছে হয়েছিল অসময়ে মালপোয়া খাওয়ার। মুখ ফুটে যে মানুষ চায় না কিছু সেই মানুষ যখন মালপোয়া খেতে চেয়েছে ইন্দুবালার ঠাম্মার আনন্দ আর গোপন থাকেনি। নিজেই গম পিষিয়ে নতুন আটা বের করেছেন জাঁতি ঘুরিয়ে। চাল কুটেছেন ঢেকিতে। বেঁটেছেন শিলনোড়ায় মিহি করে। নতুন গুড়ের হালকা একটা রস করেছেন। কয়েকদিন খুব ব্যস্ত থেকেছেন নানান তরিজুতের ছোট খাটো উপকরণ নিয়ে। আর ইন্দুবালা ঠাম্মার আঁচল ঘিরে, কাপড় জড়িয়ে, কোলে শুয়ে সেই আখ্যানের অংশীদার হয়েছে। উমনো ঝুমনোর গল্প যখন ফুরিয়ে এসেছে। শেষ মালপোয়া যখন তেলের ওপর লাল হয়ে ফুলে উঠছে। মউরির সুবাস যখন কোলাপোতা গ্রামে মো মো করে উঠছে, দাদু স্নান সেরে এসে তুলসী প্রনাম করতে গিয়ে বসে পড়লেন দাওয়ায়। জীবনের শেষ প্রার্থনা আর তাঁর করা হলো না। একদিন কথা বন্ধ রেখে পরের দিন ভোরের সূর্য ওঠার আগে দাদু চলে গেল। আম তলায় শোয়ানো থাকলো তাকে। হরিনাম সংকীর্তনের দল গোল হয়ে ঘিরে ঘিরে ইনিয়ে বিনিয়ে সুর তুললো। বাড়ি থেকে কেউ মরা কান্নার চিৎকার করলো না। ঠাম্মা বসে থাকলো পাথরের মতো। বাবা কি করবে বুঝতে পারলো না। মায়ের তখন প্রসব যন্ত্রণা। ইন্দুবালা চুপি চুপি দাওয়ার পাশে ছোট্ট বেড়ার ধারে রান্নাঘরে তখন। কাঁসার রেকাবিতে চাপা দেওয়া আছে মালপোয়া। এদিক ওদিক তাকিয়ে হাতে তুলেছিল সবে ছোট্ট মেয়েটা। গ্রামের কোন এক বউ দেখে ফেলেছিল। রে রে করে উঠে এসে ধরেছিল হাত। অশৌচের বাড়িতে খেতে আছে কোন কিছু? ফ্যাল হাত থেকে। ফ্যাল বলছি। ইন্দুবালা ফেলতে পারেনি সেই মালপোয়া। গোটা রাত ধরে নতুন গুড়ের রসে সেগুলো যেন তখন আরও অনেক ফুলে ফেপে উঠেছিল। হালকা গন্ধ বেরোচ্ছিল মউরির। এতোক্ষণ যে ঠাম্মা কারো সাথে কথা বলেননি। চুপ করে বসেছিলেন। তিনি উঠে এলেন। খুব শান্ত অথচ কঠিন গলায় বললেন, ছেড়ে দাও ওকে পাঁচুর মা। ওর খাওয়া মানে ওর দাদুর আত্মার শান্তি পাওয়া। আত্মা না জুড়ালে মায়া কাটবে কী করে? গপ গপ করে গোটা তিনেক মালপোয়া খেয়ে নিয়েছিল ইন্দুবালা। তার হাতে মুখে লেগেছিল

রস। ঠাম্মা গড়িয়ে দিয়েছিল জল। নিজে হাতে খাইয়েছিলেন নাতনিকে। ঠিক সেই সময়ে আঁতুর ঘর থেকে ভেসে এসেছিল নবজাতকের কান্নার শব্দ। ঠাম্মা নাতির মুখ দেখে বলেছিলেন সেই ফিরে আসতে হলো তো? কোথায় যাবে আমায় ছেড়ে? তাঁর বিশ্বাস ছিল দাদু ফিরে এসেছে আম, জাম, কাঁঠাল, মালপোর গন্ধ বুকে নিয়ে। বাবা ফিরেছিল শ্মশান বন্ধুদের সাথে বিকেলেরও পরে। ততক্ষণে ঠাম্মার সাদা থান পরা হয়ে গেছে। ছোট্ট ভাইটা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে তার কোলে। এদের কারো মৃত মুখ দেখেননি ইন্দুবালা। ভাগ্যিস দেখেননি।

খাটের ওপর চিৎ হয়ে শোন ইন্দুবালা। পিঠের ব্যাথাটা আরও বাড়ে। শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারেন রাস্তার উলটো দিকে কর্পোরেশানের কলে জল নিতে আসছে টুকটাক করে বাজারের লোকজন। উঠতে ইচ্ছে করছে না। সারা দেহের অবসাদ আজ যেন মনে নেমে এসেছে। ঠাম্মার মৃত্যু সংবাদ যেদিন ভাই নিয়ে এসেছিল সেদিন ইন্দুবালার সাধ। বাড়ি ভরতি লোক বিয়েতেই হয়নি সাধে হবে ভাবাটাও বোকামো। নিজের বউভাতের রান্না যেমন ইন্দুবালাকে নিজেই করতে হয়েছিল ঠিক তেমনি সাধের রান্নাটাও। গোনা গুন্তি মাছের দাগা ছিল। চাল নেওয়া হয়েছিল মাথা গুনে। শাশুড়িকে খাইয়ে। স্বামীকে খাইয়ে যখন ইন্দুবালা খেতে বসতে যাবেন দরজায় কড়া নড়লো। রান্নাঘর থেকে উঠে এসে সদর খুলতে হলো তাঁকেই। শ্রাবণের চড়া রোদ আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভাইটা। তারই সামনে। কতদিন পরে। চোখে তখন দিদির কপোতাক্ষের টলটল জল। ইচ্ছামতী গাল বেয়ে গড়াচ্ছে। বাড়িতে ঢুকতে বলবেন কি? ভাষাই হারিয়ে ফেলেছেন যেন ইন্দুবালা ভাইকে দেখে। ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা। গালে কচি ঘাসের মতো দাড়ি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। ঠিক যেন মনিরুল সেজে দাঁড়িয়ে আছে ভাই।

“ভেতরে আসতে বলবি না? এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো?”

ইন্দুবালা ভাইয়ের হাত ধরেন। ঝুপ করে যেন তাকে ছুয়ে ফেলে কোলাপোতার গ্রামটা। বোসদের পুকুর। তেপান্তরের ধানক্ষেত। কতবেলের

আচার। আর ভাই দেখে তার দিদি আরও সুন্দর হয়েছে। গা থেকে খসে গেছে অজ গাঁয়ের পুরনো চাদর। নতুন মা হবার যাবতীয় সব কিছু যেন গা থেকে ফুড়ে বের হয়ে আসছে তার। ঠিক এই সময়ে তো ইন্দুবালার থাকা উচিত ছিল গ্রামে। ঠাম্মা কি খুশী হতো। উঠোন ভরে উঠতো আচারের বয়ামে। মা বিশালক্ষ্মী তলায় পুজো দিতো।

বিরক্ত হলেন শাশুড়ি। শুভ বাড়িতে অশৌচে এয়োচো নাকি? মাথা নেড়েছিল ভাই। কাজ কর্ম মিটিয়ে তারপরে এসেছে। আরও বিরক্ত হয়ে বুড়ি বলেছিল তাহলে আর কি! গেলাও এবার ভাইকে। ইন্দুবালা আসন পেতে। কাঁসার থালায়, বাটিতে সাজিয়ে দিয়েছিল নিজের খাবারটুকু। পরম আদরে খাইয়েছিল ভাইকে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হয়। ভাইয়ের মধ্যে ইন্দুবালা কাকে খুঁজছিলেন সেদিন? বাবাকে? মনিরুলকে? নাকি নিজের ফেলে আসা অতীতকে? চলে যেতে চেয়েছিল ভাই সেদিনই। কলেজস্ট্রিট। সেখান থেকে কোন এক বন্ধুর বাড়ি। যেতে দেননি ইন্দুবালা। নিজের ঘরে শুইয়ে ছিলেন ভাইকে। ঘুমো চিন্টু। তারপরে বিকেলে না হয় বেরোস। ভাই যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে ইন্দুবালা ঠায় বসে থাকেন তার মাথার কাছে। যতক্ষণ দেখা যায়। ঘুমিয়ে থাকা মানুষের মুখের প্রশান্তি ভালো লাগে তার। এই প্রশান্তি কি মারা যাবার সময়েও থাকে না? পুকুরে ভাসছিল যে স্বর্ণলতার দেহ। তার বড় বউ সাজার শখ ছিল। রিয়াজও ভালোবাসতো তাকে খুব। স্বর্ণলতার ফুলে ওঠা দেহটাকে যখন জল থেকে তোলা হল কী যে প্রশান্তি ছেয়েছিল মুখটায়। যেন ডুব সাঁতার দিয়ে উঠলো সে এক্ষুনি। কথা ছিল রিয়াজ দাঁড়িয়ে থাকবে খেয়া ঘাটে। রাতের নৌকা তাদের পার করে দেবে সভ্য জনপদ। দূরে কোথাও তারা ভালোবাসার জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেবে। যেখানে কেউ তাদের চেনে না। জানে না। ধর্মের পরিচয় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে না। স্বর্ণলতা ঠিকই পৌঁছেছিল সময়েই। খেয়াও ছিল ঘাটে বাঁধা। শুধু রিয়াজ আসেনি। অনেক ভোরে আকাশ ফর্সা হবার আগে বাড়ি ফিরে আসার পথে স্বর্ণলতা রিয়াজকে পেয়েছিল আলের ধারে। রিয়াজের কাছে সব কিছুই ছিল শুধু প্রানটুকু ছাড়া। কারা যেন তার শ্বাসনালীটা কেটে দিয়েছিল এফোড়

ওফোড় করে। স্বর্ণলতার তখন কান্নায়, দুঃখে লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। ডুব সাঁতার দিয়েছিল সে জলে। যখন ভেসে উঠেছিল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

খবরটা প্রথমে এনেছিল মনিরুল। ইন্দুকে বলার পর ফুঁপিয়ে কেদেছিল মেয়েটা। সেদিনও যে স্বর্ণলতা স্বপ্ন দেখতো সংসারের। রিয়াজের সাথে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে কোথাও। এর আগে কোনদিন মনিরুল ইন্দুকে কাঁদতে দেখেনি। যদিও প্রথম চিঠিটা ততদিনে দেওয়া হয়ে গেছে দুজনের। ছটফট করে ওঠেন ইন্দুবালা। তাহলে কি এতোক্ষণ ভাইয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে মনিরুলের কথা চিন্তা করছিল? উঠে পড়েন্ ইন্দুবালা। পেটের ভেতর থেকে লাথি মারছে বাচ্চাটা। যেমন ক্ষিদে পেয়েছে তার মায়ের। তেমনি তারও। রান্নাঘরে এসে দেখেন চাল বাড়ন্ত। ভাত বসাবেন তার যোগাড়টুকু নেই। এই এতো বেলায় কি খাবেন? নজরে পড়লো বেতের ঝুড়ি শালপাতায় মোড়া। ভাই এনেছে। তাকে এতোক্ষণ যত্ন আত্তি করতে গিয়ে সেদিকে নজরও পড়েনি। ভুলেই গিয়েছিলেন ইন্দুবালা। শালপাতায় বাঁধা টুকরিটা খুললেন। তারমধ্যে থরে থরে সাজানো আছে মালপোয়া। চোখ ফেটে জল এলো ইন্দুবালার। গোগ্রাসে খেতে থাকলেন তিনি। যেন কত জন্মের ক্ষিদে নিয়ে তার দাদু ঢুকে পড়েছে তাঁর পেটে। ঠাম্মার হাতে না হোক গাঁয়ের ভোলা ময়রার দোকানের মালপোয়া খেতে চাইছে গোটা শরীর তোলপাড় করে। অনেকটা খাওয়ার পর যখন থামলেন ইন্দুবালা। জলতেষ্টা পেয়েছে বড়। কিন্তু জল এগিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই। ঠিক তখন সেই মুহূর্তে বুক ছাপিয়ে, গলা কাঁপিয়ে কান্না পেলো তাঁর মৃত ঠাম্মার জন্য। পায়ের তলায় গোটা পৃথিবীটা যেন নড়ে উঠলো হঠাৎ। চোখে অন্ধকার দেখলেন। যা খেয়েছিলেন উগড়ে দিলেন সব। রান্নাঘর ভেসে গেল সাধ না খাওয়া নতুন মায়ের বমিতে।

দরজা খোলার শব্দ পেলেন ইন্দুবালা। ধনঞ্জয় ঘর ঝাঁট দিতে এসেছে। নীচের রান্নাঘরে উনুনের ধোঁওয়া কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। বাজার কিন্তু কিচ্ছুটি করা নেই মা। কি রান্না হবে? ধনঞ্জয় জানতে চায়।

ইন্দুবালা চুপ করে থাকেন। কী গো বলো কিছু? শরীর খারাপ নাকি তোমার? ইন্দুবালা ধোঁওয়া দেখছেন। কুন্ডুলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠছে। বাজারের লোকেরা এসে বলেছিল নিমতলার ইলেকট্রিক চুল্লীতে কাজ চলছে মা। বডি কাঠে পোড়াতে হবে। তখনও শ্মশানে স্বামীর খাট ছুঁয়ে বসে আছেন ইন্দুবালা। দূরে লছমী ছেলে-মেয়েদের সামলাচ্ছে। তোমরা যা ভালো বোঝ করো। এই টুকুই বলতে পেরেছিলেন তিনি। মাষ্টার রতনলাল মল্লিকের বডি যখন চিতায় তোলা হল তখনও ইন্দুবালা আঁচ করতে পারেননি কাঠে পোড়ানোর বিভৎসতা। প্রিয় মানুষ ছিল না কোনদিনই মাষ্টার। কিন্তু যে মানুষটা চারপাশে ঘুরে বেড়াতো, এদিক ওদিক দিয়ে যন্ত্রণা দিতো। সময় নেই অসময় নেই ঘাড়ের ওপর চেপে বসতো। জোর করে সরিয়ে দিত শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ। সেই মানুষটা আগুন পাওয়ার সাথে সাথে কেমন যেন চড়বড় করে উঠতে শুরু করলো। শরীর ফুড়ে বেড়িয়ে আসতে থাকলো জল। যেন সারা জীবনের হুইস্কি, সোডা এক্ষুনি এই জ্বলন্ত সর্বগ্রাসী চিতাকে নিভিয়ে দেবে। লছমী এসে মুখ ঝামটা দিয়েছিল। কী করছিস কি এখানে দাঁড়িয়ে তুই? আমাদের কি এসব দেখতে আছে? চল মেয়েটাকে দুধ খাওয়াবি চল। বড় কাঁদছে যে। কি দেখেছেন আর কি দেখেননি সেই হিসেব কষতে গেলে বেলা কাবার হয়ে যায় ইন্দুবালার।

পাশ ফিরে শুয়ে ধনঞ্জয়কে বলেন উনুন ধরিয়েছিস কেন? গ্যাস কি ফুরিয়েছে? ধনঞ্জয় হাতের ঝাটাখানা মেঝেতে রেখে বলে ওই দেখ। আজকের দিনটা কি ভুলে গেলে মা তুমি? ইন্দুবালা হাতড়াতে থাকেন মনের মধ্যে। আজকে আবার কী? ধনঞ্জয় মাথায় হাত দিয়ে বলে সত্যি এবার তোমার বয়েস হয়েছে মা। আজ যে রথ। ভুলে গেলে সব কিছু? কুমোরটুলিতে দুর্গার কাঠামোয় মাটি পড়বে। ইস্কনের লম্বা রথ বেরোবে। কত সাহেব সুবো নাচানাচি করবে।... হোটেলের সামনে বোর্ডে তো গতকাল লিখে রেখেছো...। উঠে পড়েন ইন্দুবালা। কী লিখেছি রে? খিচুরী, পাঁপড়ভাজা, আনারসের চাটনি, আর কাঁঠালের ক্ষীর। বিড়বিড় করে জানতে চান ইন্দুবালা, আর মালপোয়া? ধনঞ্জয় রে রে করে ওঠে। না না ওইসব একদম কিচ্ছু লেখা ছিল না। হাঙ্গামা

বাধিও না মা। চিনির দাম বড্ড বেড়েছে। আটা বাড়ন্ত। ময়দা বাড়ন্ত। গোল মরিচ আনা নেই। ইন্দুবালা জানতে চান আর মউরি? ধনঞ্জয় জবাব দেয় না। চিরকালের অভ্যেসের মতো সে কাকে যেন একটা গাল পাড়ে। সেই অদৃশ্য মানুষটাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে ইন্দুবালার। কিন্তু তিনি জানেন ধনঞ্জয়ের একমাত্র ইন্দুবালা ভাতের হোটেল ছাড়া আর কেউ নেই। ঠিক যেমন চারপাশে তিন ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি থেকেও ইন্দুবালা একা। তাঁরও এই ভাতের হোটেল ছাড়া কেউ নেই।

অনেক রাতে কলেজস্ট্রিট পাড়া ঘুরে বাড়ি আসে ভাই। হাতে তার একখানি চটি বই। 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন'। বেড়াতে যাওয়ার বই বুঝি? ইন্দুবালা জানতে চান। ভাই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। খুলে দেখলেই বুঝতে পারবি। এগিয়ে দেয় বইটা। ইন্দুবালা অবাক হন। কবিতা পড়িস নাকি তুই আজকাল? ঘাড় নাড়ে ভাই। তুই আর মনিরুলদা যেমন পড়তিস। কথা বাড়াতে চান না ইন্দুবালা। এরপর কথা বললে আরও অনেক কথা উঠবে। সেই কথা মনের মধ্যে হাওয়ার সাথে উথাল পাথাল হলে রাতে ঘুম হবে না। এই ভরো ভরো অবস্থায়ও মাষ্টার রতনলাল মল্লিক আঁকড়ে ধরতে চাইবে তাকে। দম বন্ধ হয়ে আসবে তার। মাটিতে এখন তাই বিছানা। শরীরটাকে কোনরকমে আড়াল করার চেষ্টা। ওপরের ঘরে শুতে ভয় করবে তোর ভাই? অবাক হয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকায় ভাই। একদম মনিরুল। চোখ সরিয়ে নেয় ইন্দুবালা। ভয় করবে কেন? আমি তো এখন একাই শুই মাঝের ঘরটা। ঠাম্মার ঘরটা তো বন্ধই থাকে। ইন্দুবালা জানতে চান, ভয় করে না তোর? ভাই বলে ধুস...। ভয় করবে কেন? ইন্দুবালার যখন বিয়ে হয় তখন ভাই তার কাছে শুতো। জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে। কতটুকুনি ছিল তখন। আর একদিন থেকে যাবি? মাথা নাড়ে ভাই। নারে হবে না দিদি। কাল তো রথ। স্কুল ছুটি। পরশু পরীক্ষা। না গেলে স্যার খুব বকবে। আর বাবার শরীরটাও...। থেমে যায় ভাই। ইন্দুবালা জানে তার বাবার শরীরও ভালো না। মাঝে মাঝে জ্বর হয়। কাশি হয়। মা লিখেছে কাশির সাথে রক্ত ওঠে। ভাই ঘুমিয়ে পড়ে। ইন্দুবালা টেনে নেয় পাশে রাখা চটি বই খানা। কবে থেকে পড়তে শুরু করলো তার ভাই কবিতা? তিন

পাহাড়ের স্বপ্ন কবিতার বইটার লেখক কে যেন এক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পাতা খানা উলটে দেখলো ইন্দুবালা। আর ঠিক তখনি ডাক পড়লো তার নীচের থেকে। মাষ্টার রতনলাল মল্লিক ঘরে অপেক্ষা করছেন।

পেঁচিয়ে উঠছে ইন্দুবালা। তার গা দিয়ে। শরীর দিয়ে। আরও একটা শরীর পেঁচিয়ে উঠছে। মাষ্টার রতনলাল মল্লিক তার পোয়াতি বউটাকে পেঁচিয়ে উঠছে। ঠিক যেমন বিষধর সাপ ওঠে গাছের গায়ে। বন্ধ হয়ে আসছে ইন্দুবালার শ্বাস প্রশ্বাস। ভাই যেন চিলে কোঠার ঘর থেকে পড়ে চলেছে ছোট্ট চটি বইখানি খুলে। গড়গড় করে। “ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম /শঙ্খ চূড়ের কান্না/ ‘এ আনন্দ অসহ্য বোন;/ দিসনে লো আর, আর না’।/ জেগে উঠলাম; দেখতে পেলাম/আর না দেবার সুখে/কেয়া ফুলটি ঘুমিয়ে আছে/বিষধরের বুকে।” গলা বুজে আসছে ইন্দুবালার। কান্নায়। ঘেন্নায়। ভোররাতে উঠে ঠান্ডা জল মাথায় ঢালেন তিনি। একবার নয় বারবার। তারও অনেক দিন পরে। ভাই যখন আর নেই। স্বামী যখন আর নেই। চারিদিক শূন্য খাঁ খাঁ। হোটেলের ঘরে কে যেন একটা কবিতার বই ফেলে রেখে গিয়েছিল। পড়ে ফেলেছিলেন ইন্দুবালা কবির নামটা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখন কলকাতায় বোমা। রাস্তায় ঘাটে মৃত দেহের সারি। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলো গঙ্গায় ভাসছে লাশ হয়ে। অনেক রাতে একটা ছেলে বইটা ফেরত নিতে এসেছিল লুকিয়ে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এক পেট ক্ষিদে। হ্যাঁ সেদিনটাও ছিল রথের দিন। মনে আছে ইন্দুবালা পাঁপড় ভেজেছিলেন। হিঙের গন্ধ মাখানো খিচুড়ি হয়েছিল। আর ছিল চুসির পায়েস। প্রথম দিন ইন্দুবালার সাথে তার কোন কথা হয়নি। কোঁচড় থেকে রিভলবারটা বের করে রেখেছিল টেবিলে। অলোকের কথা আগেও অনেকবার বলেছে ইন্দুবালা আপনাদের। তবে বিস্তারের ব্যাখ্যান অবশ্যই আসবে পরে। সাধে কি আর ভালোবেসে নাম দেবেন প্যাঁচা?

তাড়াতাড়ি শিল নোড়া পেড়ে ফেলে ধনঞ্জয়। এই বেলা চাল না বেটে রাখলে বুড়ি নিজেই বাটতে শুরু করে দেবে। এই গুচ্ছের লোকের জন্য মালপোয়া বানানো কি মুখের কথা? এরই মধ্যে জলহস্তির ছানা গুলো ঘুরে

গেছে। মানে সামনের হোস্টেলের ওই ছেলে মেয়ে গুলো। ঠাকুমা দেওয়ালে কি লিখছে দেখতে এসেছে হুড়মুড়িয়ে। কি গো সব পালটে দিচ্ছো নাকি? শুক্তো ভাত এই সব কিন্তু কিচ্ছু খাবো না আজকে। ছোট করে ছেলেদের মতো চুল ছাটা মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে। ধনঞ্জয়ের মনে হয় ঠাস করে গালে একটা ঠাটিয়ে থাপ্পড় দিই। সেদিন আবার সিগারেট কিনছিল দেখেছে ধনঞ্জয়। ইন্দুবালাকে বলতে এলে নিজেই ধাঁতানি খেয়েছিল বেশি। কেন তুমি বিড়ি ফোঁকো না? তাও তো ওরা মনের সুখে দুটো টান দিতে পারে। আমরা কি পেয়েছি জীবনে? ধনঞ্জয় কথা বাড়ায়নি আর। বাবুই পাখির বাসার মতো চুল যে ছেলেটার সেটা আরও ধ্যাষ্টা। কী গো? কি কি চেঞ্জ করছো? তাই বলে কাঁঠাল ক্ষীরটা চেঞ্জ করো না প্লিজ। ওটার যে গল্পটা বলেছিলে সেটা কিন্তু আমি কালকে ফেসবুকে শেয়ার করেছি। ওখান থেকে অনেকে আসবে বলেছে খেতে। মোটা ছেলেটা এরপর এগিয়ে আসে। তোরা বড় ছটফট করিস। আগে দেখ না কি লেখে ঠাকুমা। একরাশ ছেলে মেয়ে। আর তাদের মাঝে সত্তর পেরোনো এক বুড়ি সাত সকালে ভাতের হোটেলের সামনে ভিড় করে থাকে। খিচুড়ি, পাঁপড়ভাজা, আনারসের চাটনি, কাঁঠাল ক্ষীরের নীচে বড় করে লেখা হয় মালপোয়া। ভিড়টা যেন একসাথে চিৎকার করে ওঠে ইয়া...। জড়িয়ে ধরে ইন্দুবালাকে ওরা সবাই। কেউ তার মধ্যেই ফেসবুক লাইভ করে দেয়। কাল যে আপনাদের কাঁঠাল ক্ষীরের গল্পটা বলেছিলাম আজ তার সাথে ইনক্লুড হয়েছে মালপো...। জোরে জোরে চাল বাটে ধনঞ্জয়। কারণ সে জানে এরপর স্নান সেরে এসে রান্নার ধুম পড়বে বুড়ির। একটা নেশার মধ্যে থাকবে সেই দুপুর পর্যন্ত। যতক্ষণ না শেষ রান্নাটুকু হয়। যতক্ষণ না শেষ মানুষটা খেয়ে চলে যায় হোটেল থেকে।

নতুন সাইকেল কিনেছে মনিরুল। সেটা দেখাতে এসেছিল। ইন্দু জানে এটা একটা অছিলা। আসলে তারা আজ যাবে মোক্তার পাড়ায় রথের মেলায়। মাকে কি করে বলবে? সাইকেল শেখাটা খুব সহজ মিথ্যের রাস্তা। ছেলে মেয়ে দুটো বাড়ছে যেন তালগাছের মতো। মায়ের মন সায় দিতে চায় না। তার

আগে বাবা বলে দেয় সরল মানুষের মতো যাবি তো যা না। সামনের বারে আর একটু বড় ক্লাসে উঠলে ইন্দুকেও কিনে দেবো সাইকেল। তখন দুজনে একসাথে স্কুলে যাবি সাইকেল চালিয়ে। সে সৌভাগ্য হয়নি ইন্দুবালার। তার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার। স্বর্ণলতার আত্মহত্যা চোখ খুলে দিয়েছিল অনেক মায়ের। তারা কিছুতেই আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখতে চায়নি। বরং আগুনেই মেয়েকে বিসর্জন দিয়েছিল। জ্বলে পুড়ে শেষ হয়েছিল মেয়ে গুলো। কজন ইন্দুবালা হতে পেরেছিল? যাদের নিয়ে লেখা হয়েছিল খবরের কাগজে? ফেসবুকে?

সামনের রডে বসতে লজ্জা করেছিল ইন্দুর। তবুও বসেছিল সে। হাওয়ার মতো উড়ছিল মনিরুলের সাইকেল কপোতাক্ষের তীর ধরে। হাতে হাত ঠেকে যাচ্ছিল দুজনের। শ্বাসে প্রশ্বাসে চরম উত্তেজনা। ওরা কাছ থেকে পাচ্ছিল দুজনের ওম। চোখ বন্ধ করেছিল ইন্দু। সে যেন কাঠের নাগোরদোল্লা, ঘোড়ার দোল্লা, বুড়ির চুল, ঝাল ঘুগনি, পাঁপড় ভাজা রথের মেলা এইসব ছাপিয়ে মউরির গন্ধ পাচ্ছিলো মনিরুলের গা থেকে। যে মউরির গন্ধ পেয়েছে সে তার ঠাম্মার মালপোয়ায়। ভোলা ময়রার দোকানে। অনেক পরে রিভলবার নিয়ে খেতে আসা অলোকের কবিতার বইয়ে। স্নান সেরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ান ইন্দুবালা। কতদিন পর আজ তিনি মালপোয়া ভাজবেন? তাঁর চোখে মুখেও কি ফুটে উঠছে না এক প্রশান্তি? যা কি মৃত্যুর বার্তাবহ? মনিরুলের মৃত মুখ তিনি দেখেননি। কিন্তু আন্দাজ করতে পারেন। খান সেনারা গোটা বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মনিরুল তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। গোটা বাড়িটা যতক্ষণ না জ্বলন্ত সূর্য হয়ে উঠছে মনিরুল ততক্ষণ চোখ বন্ধ করছে না। সে জানে একটা ভাষার জন্য একটা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে সে। আর ইন্দুবালা? কি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি? সে কথা কেউ কোন দিন জানতে চায়নি। আজও না।

হইচই পড়ে গেছে গোটা অঞ্চল জুড়ে। ছেনু মিত্তির লেনে একেই ভিড় লেগে

থাকে। আজ যেন আরও বেশি ভিড়। তাও সেটা ইন্দুবালা ভাতের হোটেলকে ঘিরে। হাফবেলা অফিস করে কালেক্টার অফিসের কেরানীকুল চলে এসেছে।

হোস্টেলের ছেলে মেয়ে গুলো হাজির হয়েছে। তার সাথে নিয়মিত বাজারের খদ্দেররা আছে। কিছু ফ্লাইং কাস্টমার তো থাকেই। এর সাথে জুড়েছে রাজ্যের ফেসবুক ফ্রেন্ডরা। চারিদিকে শুধু কচিকাচাদের কলকলানি। মাথা খারাপ হবার অবস্থা ধনঞ্জয়ের। হোটেলটাও হয়েছে আজ দেখার মতো। সেখানে যেন তার প্রবেশ নিষেধ। ছেলে মেয়ে গুলো নিজেরাই হাতে হাতে কাজ করে নিচ্ছে। কেউ জল দিচ্ছে। কেউ ক্যাশ সামলাচ্ছে। কেউ থালা পাতছে। কেউ পরিবেশন করছে। আর রান্নাঘরের দিকে তো যাওয়াই যাচ্ছে না। সেখানে আরও ভিড়। সবাই ঝুঁকে পড়েছে তাদের মোবাইল ক্যামেরা নিয়ে। সেই ছোট্ট স্ক্রিনে ফুলে ফুলে উঠছে লাল হয়ে যাওয়া মালপোয়া গুলো। বড় ছাকনিতে সোজা চলে যাচ্ছে চিনির হালকা রসে। মউরির গন্ধ, গোল মরিচের স্বাদ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আর এসবের মধ্যে প্রশান্তি মাখা মুখ নিয়ে রান্না করে চলেছেন ইন্দুবালা। না এই মুহূর্তে স্মৃতিরা তার আসেপাশে কেউ নেই। নেই খুলনা...কোলাপোতা...ছেনু মিত্তির লেন। এখন তিনি যেন এক শিল্পী। কারিগর। নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে আছেন। তার বুড়ো ডালপালা গুলো চারিদিক থেকে যেন শুষে নিচ্ছে তারুণ্যের আস্বাদ। নতুন করে বেঁচে থাকার আকাঙ্খা।

ছয়

চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল

কোলাপোতা গ্রামটার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কপোতাক্ষ। এছাড়া চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খাল বিল পুকুর। সবুজ জংলা ঝোপের পাশে সন্ধ্যামণি ফুল। হেলেঞ্চার লতা। উঠোনের কোন ঘেঁষে কাঠ চাঁপা। পঞ্চমুখী জবা। সদরের মুখটায় শিউলি। সাদা আঁচলের মতো পড়ে থাকে ফুলগুলো। উঠোনের মাঝখানে বড় তুলসী মঞ্চ। অষ্টপ্রহরের সময় ঘুরে ঘুরে কীর্তন হয় সেখানে। বাড়ির পেছনে আছে নারকেল গাছ বেয়ে ওঠা চুইঝাল। রান্নায় এতোটুকু ঝালের দরকার হলে মা টুক করে গিয়ে ছোট্ট ডাঁটি পেড়ে নিয়ে আসে। একটু ছেঁচে ফেলে দেয় ঝোলের মধ্যে। নারকেল গাছটা সোজা রেখে এগিয়ে গেলে পুঁইয়ের মাচা। তার ডগা গুলো বর্ষার জল পেয়ে যেন আকাশের দিকে মুখ করে আছে আরও বৃষ্টির আকাঙ্খায়। পুঁই মাচাকে বাঁদিকে রেখে কয়েক পা হাঁটলেই কলকাতা থেকে আনা দাদুর ডালিম গাছ। তার পাশেই ঠাম্মার নিজের হাতে আদর করে বসানো গন্ধরাজ লেবু। কালনার আতা। এইরকম সাজানো গোছানো বাড়ি এই গ্রামের অনেকেরই আছে। অবস্থা সম্পন্ন গেরস্থ হিন্দু বাড়ির ঘর দোর সাজানো এক রকমের। আবার অভিজাত মুসলিম বাড়ির অন্দরের সাজ ভিন্ন ধরনের। ইন্দুবালার মনে আছে মনিরুলের বাড়ির পেছন দিকে একটা বড় পুকুর ছিল। তার পেছনে বাঁশ ঝাড়। তারপর আদিগন্ত ধান ক্ষেত। গ্রামের অনেকের বাড়িতেই বড় করে কাটানো পুকুর কিম্বা ডোবা ছিল। আর সেগুলিতে ছিল বিস্তর মাছ। গেরস্থালির জলটুকু ওই পুকুর বা ডোবা গুলোই মিটিয়ে দিত। তখন আর টিউবওয়েল কোথায়? সেই হাতে চাপা কল আসতে অনেক দেরী হয়েছে। ইন্দুবালার তখন সবে বিয়ের কথা চলছে।

গ্রামে প্রায় সবার বাড়িতে থাকলেও ইন্দুবালাদের বাড়িতে কোন পুকুর বা ডোবা ছিল না। কেন ছিল না সেটা নিয়ে একটা গল্প সে ছোট্ট থেকে শুনে আসছে। কিন্তু সেই গল্পে প্রবেশ করার আগে এই মুহূর্তে ইন্দুবালা কি করছে সেটা জেনে নেওয়াটা আখ্যানের ক্ষেত্রে জরুরী। বর্ষা এবার দেরীতে শুধু নয় আষাঢ় পার করেও দেখা দিচ্ছে না। ভ্যাপসা গরমে সবার নাজেহাল দশা যখন মধ্য সত্তরের ইন্দুবালার অবস্থা কি হতে পারে তা তিনি যেন নিজেই বুঝে নিতে চাইছিলেন বিকেলের দিকে মেঝের ওপর শুয়ে। কিছুক্ষণ আগে শেষ খদ্দের ভাত খেয়ে চলে গেছে। যা বাকি ছিল হাড়ি চেঁচে পুছে খাওয়ানো হয়েছে বাজারের ভিখারিদের। এমনকি কালু, ভুলু, নেলু বাজারের যে হরেক নামের বিড়াল এবং কুকুর আছে তাদেরও পাতের উচ্ছিষ্টাংশ এক জায়গায় জড়ো করে ধনঞ্জয় খাওয়ায়। লছমী নিজে হাতে শুরু করেছিল। সেই প্রথা আজও দিব্য বহাল আছে। সবই ঠিক ছিল। এর সাথে যদি বাড়ির সঙ্গে একটা পুকুর থাকতো। তাহলে বেচারা ধনঞ্জয়কে কর্পোরেশানের ছিরছিরে জল পড়া কলে ওই অতক্ষণ ধরে বাসন মাজতে হতো না। আজ অনেক ভোরে প্রচন্ড গরমে ঘুম ভাঙার পরেই কেমন যেন বোসদের পুকুরটার কথা মনে পড়ছে তাঁর। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কপোতাক্ষকে। এমনকি শাশুড়ি যে পালা পার্বণে গঙ্গার স্নানে নিয়ে যেত তাও। সক্কাল হতে না হতে আজ নিজে থেকেই কেমন যেন ডুব দিয়ে স্নান করার বাসনা মনের মধ্যে জাগছিল ইন্দুবালার। কত দিন গভীর গহন জলে ডুব দেননি তিনি। এই সময় তো কপোতাক্ষের একূল-ওকূল ভাসে। গভীর রাতে জলের আওয়াজ যেন দোর পর্যন্ত এসে কলকল করে কত কথা শুনিয়ে যায়। বোসদের পুকুরের জল আরও ঘন সবুজ রঙ নিয়ে ভারী হয়ে ওঠে। পাশের ঝোপ থেকে অনবরত ডেকে চলে ঝিল্লি। ভিজে গায়ে বাড়ি ফিরতে স্যাঁত স্যাঁত করে ওঠে গা। ইন্দুবালার হঠাৎ আজ কেমন যেন ইচ্ছে হল অমন বৃষ্টিভেজা ঝোপে ঢাকা মাটির রাস্তা দিয়ে স্নান করে ফিরতে। কিন্তু সে পথ কোথায় পাবেন তিনি ছেনু মিত্তির লেনে? আজ অনেক সকালে ঘুম ভেঙে তাই নীচে চলে এসেছিলেন।

"ধনঞ্জয়...ও ধনঞ্জয়...। ওঠ না বাবা। আমাকে একটু গঙ্গা স্নান করিয়ে

এনে দে।”

ধনঞ্জয় চোখ কচলায়। ধড়মড় করে উঠে বসে। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মা? রোজ রাতে ঘিষঘিষে গা গরম থাকে তোমার। ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছো। তার ওপর তোমাকে নিয়ে গঙ্গা স্নানে গিয়ে আমার নিজের গঙ্গাপ্রাপ্তি হোক তাই না? তোমার ছেলেরা এসে আমাকে দুরমুশ করুক। হবেক নাই।

ধনঞ্জয় বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে। যত বয়স বাড়ছে, চুল যত পাকা হচ্ছে তত মুখের বুলি ফুটছে। রেগে যান ইন্দুবালা। যেতে হবে না। তোকে আজ কোন কাজ করতে হবে না ধনা। আমি নিজেই আজ সব কিছু করবো। ধনঞ্জয় বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বলে করো। ইন্দুবালা সত্যি সত্যি বাসি কাপড় ছেড়ে বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অনেক দিন পরে তিনি নিজে বাজারে যাচ্ছেন। একবার নিজে মনে করে দেখে নেন ব্লাউজের ফাঁকে টাকার ব্যাগটা নিয়েছেন কিনা। অনেক সকালে মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিংশুক হীনযান ও মহাযানের তার্কিক পয়েন্ট গুলো মিলিয়ে দেখছিল। বৌদ্ধ শ্রমণদের মতো ‘উষাকালীন মেঘমালা’ দেখার জন্য সে বেশ কয়েকদিন ট্রাই করেছে। কিন্তু মোবাইলে এলার্ম বেজে গেছে তার মতো করে। আর কিংশুক নিজে পাশ ফিরে শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে ভাত খাওয়ার সময়ে উঠেছে। আজ কি কুক্ষণে যে এতোটা গরম পড়েছে আর ঘুম ভেঙেছে সে বুঝতে পারছিল না। যাইহোক উঠেই যখন পড়েছে তখন সে ইতিহাসের চ্যাপ্টার গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলো। সামনেই বিএ ফাইনাল। নালন্দা থেকে হস্তিনাপুর হয়ে তিব্বতে যাওয়ার আগে সে দেখলো ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের দরজা খুলে স্বয়ং ইন্দুবালা বেরিয়ে পড়লেন। হীনযান মহাযান মধ্যপথে রইলো। কিংশুক চিৎকার করলো, ও দিদা? এতো সকালে কোথায় যাচ্ছো? ইন্দুবালা হাতের ব্যাগখানা উঁচু করে দেখালেন। কিংশুক হুড়মুড় করে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে। চলো আমিও যাবো। ইন্দুবালা অবাক হয়ে তাকান কিংশুকের দিকে। তুই যাবি কেন? ভোররাত থেকে তো দেখলাম পড়াশুনো করছিস। ঘরের আলো জ্বলছিল যে। কিংশুক বলে ধুর পড়ছিলাম

কোথায়? বেজায় গরমে ঘুম আসে নাকি? তারচেয়ে বরং এটাই ভালো হলো তোমার সাথে বাজার করতে যাবো। দাও দেখিনি ব্যাগ দুটো। ইন্দুবালার হাত থেকে কিংশুক ব্যাগ দুটো নিয়ে নেয়। ছেলেটাকে ভালো লাগে ইন্দুবালার। সময় নেই অসময় নেই মেসের বারান্দা থেকে দিদা বলে হাঁক দেয়। ওদের ঘরটা ইন্দুবালার ঘরের ঠিক সামনে। রাস্তার উলটো দিকে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম না এলে ইন্দুবালা সেলাই ফোড়াই করেন। কিংশুক চিৎকার করে ওপারের জানলা দিয়ে। এবার তো ঘুমোও। তোমার চোখ খারাপ হলে আমাদের উপোষ করে থাকতে হবে। তোমার ধনার যা রান্নার হাত। নীচ থেকে ধনঞ্জয় কাঁইমাই করে শাপশাপান্তর করে। তার যত অভিযোগ ইন্দুবালাকে। তারজন্যেই ওই গাল টিপলে দুধ বেরোনো ছেলে গুলো তাকে হতচ্ছেদ্দা করে। যদিও খেতে না এলে ধনঞ্জয়ই ওদের ডেকে নিয়ে আসে। আদর করে বসিয়ে খাওয়ায়। শরীর খারাপ হলে সাতবার গিয়ে খবর নিয়ে আসে। ছেলেরাও ভালোবাসে তাকে খুব। জর্দাটা, বিড়িটা হয়ে যায় ওই ছেলেগুলোর কল্যাণেই।

"আজ কি বাজার করবে দিদা?"

"কেন? হোটলের বোর্ড দেখিসনি?"

"দেখেছি তো। ভাত, সোনা মুগের ডাল, মোচার ঘন্ট, মাছ...। ওই দেখো...কোন মাছ লেখোনি কিন্তু।"

ইন্দুবালার সামনে দিয়ে তখন মাথা ভর্তি কলমি শাক নিয়ে যাচ্ছে একটা বউ। ইন্দুবালা থমকে দাঁড়ান। ও বউ শুনছো...। বউটা ঘুরে তাকায়। কলমি শাক কোথায় পেলে? তোমার বাড়ির? বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছো? বউটা হাসে। মেয়ের বাড়ি গেছিলাম...। আমার তো আর পুকুর নেই...। ওর শাউড়ির বড় একটা পুকুর ছেল। তা সেই পুকুরের...। ইন্দুবালা বলে ছিল কেন বলছো? এখন আর নেই? বউটার মাথা থেকে কিংশুক শাকের বোঝাটা নামাতে সাহায্য করে। হাঁপ ছাড়ে বউটা। ডোবা হয়ে গেছে মা। এবার হয়তো ফ্ল্যালাট উঠবে। তা মেয়ে বললো নিয়ে যাও। যে কদিন আছে। ইন্দুবালা

কলমি শাকের আঁটি তোলেন। সবুজ কচি মাথা গুলো সবাই যেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নাকের কাছে নিয়ে এসে শোকেন। কিংশুক জানতে চায় এইভাবে বুঝি শাক চেনে? গন্ধ শুকে? হাসে বউটা। না গো না। মা আমার পুকুর চিনছে গো...। ইন্দুবালার সামনে ভেসে ওঠে বর্ষার জলে থইথই উঠোন। ভাই বোনে মিলে নাচানাচি। আমাদের কেন পুকুর নেই ঠাম্মা? ততক্ষণে ঠাম্মার কলমি শাক বাছা শেষ। বারণ ছিল যে বংশে। কেন বারণ তার বিস্তারিত গল্পে এবার আসা যাক। কারণ ইন্দুবালার বাজার করতে সময় লাগে ঢের।

ইন্দুবালার দাদুর দাদু যখন কলকাতার পাট চুকিয়ে খুলনার কোলাপোতায় পিতৃস্বত্ত্ব রক্ষার জন্য থাকতে শুরু করলেন তখন বর্ষাকাল। চারিদিকে উপছাপা হয়ে আছে নদীগুলো। খাল গুলো। বিল গুলো। বাড়ির মধ্যে চারিদিকে থই থই করছে জল। কোনটা পুকুর আর কোনটা উঠোন তা ঠাহর করা বেশ মুশকিল হচ্ছে। হামেশাই শোনা যাচ্ছে গ্রামে সাপে কেটে মৃত্যুর খবর। এদিকে যাকে বিয়ে করে এনেছে বিশ্বম্ভর সে এক্কেবারে শহুরে মেয়ে। খাস নবদ্বীপের। সেই মেয়ে এই অজ গাঁয়ের চারিদিকে জল, সাপে কাটা এইসব দেখে প্রথম দিনই তো পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে। তার সৎ মা যে তার সাথে এই অবিচার করবে কোনদিন সে ভাবতে পারেনি। ভালো পাত্রের কি আকাল পড়েছিল জ্যোৎস্নাময়ীর জন্যে? কত কত সম্বন্ধ এসেছিল বর্ধমান, রাজশাহী, হাতিমপুর থেকে। ময়মনসিঙ্গের এক জমিদারও এসেছিলেন। বাবা বুড়োর সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন না বলে সেই সম্বন্ধও নাকচ হল। শেষকালে মেয়েকে গৌরীদান করবেন নাকি? যারা আসে তারা নাকচ হয়। এদিকে সৎমা রাগে শুধু ফুলে ফুলে ওঠে। তারই বয়সী এক মেয়ে বাড়িতে থাকবে ঘাড়ের ওপর? এখন চুপ করে আছে, পরে এই মেয়ে যে ফোঁস করবে না তা কে বলতে পারে? জ্যোৎস্নাময়ীরও বয়ে গিয়েছিল সেই মেয়েটিকে মা বলতে। দুজনের মুখ দেখা দেখি বন্ধ ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী থাকতো দোতলায় তার মায়ের দিকে। আর নতুন মা তার নতুন দাস-দাসী নিয়ে এক তলায়। ওপর নীচ করায় বাবার অসুবিধে হতো। হাঁপের টান

ধরতো। হাঁপাতে হাঁপাতে জ্যোৎস্নাময়ীর বাবা তার মেয়ের বয়সী নতুন বউকে বোঝাতো ওই তো বয়েস মেয়েটার। ওকে এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে দিই কী করে? আর দিলেও সুপাত্রের হাতে দিতে হবে তো? বুড়ো স্বামীর এই দ্বিচারিতা যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল নতুন মাকে। মুখঝামটা দিতো যখন তখন। মেয়েকে বিয়ে দেবেন না দোজবুড়োর সাথে অথচ নিজে বিয়ে করে এনেছেন মেয়ের বয়সী একটা মানুষকে। বাড়িতে যখন অশান্তি চরমে ঠিক সেই সময়ে শহরে কলেরার জন্য ভলেন্টিয়ার হয়ে এলো একদল যুবক কলকাতা থেকে। তারা গান্ধীজীর স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত। বিবেকানন্দের সেবা তাদের বুকে। রবীন্দ্রগানের কলি তাদের লক্ষ্য। একদল উঠতি যুবকদের মধ্যে যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল জ্যোৎস্নাময়ীর বাবার। বেশ গোল গোল চোখ। চওড়া ছাতি। বুকের পাটা আছে বলেই না কলেরা রোগী দেখতে আসে। তিন কুলে একমাত্র খুলনায় পিতা ছাড়া আর কেউ নেই। ঝাড়া ঝাপটা হাত পা। কথায় বার্তায় নম্র, শান্ত, সদালাপী। সর্বোপরি কর্মোঠ। এমন একটা ছেলেকেই যেন মনে মনে খুঁজছিলেন তিনি। দেরী করলেন না জ্যোৎস্নাময়ীর বাবা। কথা চললো তাড়াতাড়ি খুলনা আর নবদ্বীপের মধ্যে। পাকা কথা হয়ে গেলে আশ্বাস দিলেন বাবা মেয়েকে। ভয় পাস না মা। এই জামাই আমার সোনার জামাই হবে দেখে নিস। কলকাতায় কত বড় একটা মেসে থাকে। দেখবি তোকে নিয়ে গিয়ে কেমন টেরাম লাইনের পাশের বাড়িতে রাখে।

জ্যোৎস্নাময়ী কোনদিন টেরাম দেখেনি। শুনেছে দুটো লিকলিকে লাইনের ওপর দিয়ে সেই টেরাম কলকাতা শহরে চক্কর মারে। সাহেব সুবোরা সেই টেরামে ওঠে। যে যার জায়গায় চলে যায়। ঠুং ঠুং করে কাচের চুড়ির মতো আওয়াজ হয় টেরামে। জ্যোৎস্নাময়ী তো সেই টেরাম লাইনের পাশের বাড়িতে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। এদিকে তার বিয়ে হয়ে গেল বেশ ঘটা করে বোশেখের কোন এক শুভ দিনে। ফুলশয্যার খাটে শুতে এসে জানতে পারল বিশ্বম্ভরের পরিকল্পনা। বিয়ে করে সে আপাতত বউকে রেখে যাচ্ছে বাপের বাড়ি। এই কদিন জ্যোৎস্নাময়ী একটু মানিয়ে গুছিয়ে এখানে থাকুক।

কারণ মাত্র কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় যাওয়া মানে খরচ। একেই নতুন বউ তার ওপরে বাড়ি ভাড়া করা, সংসার নতুন করে পাতানো খুবই ঝামেলার হবে। আর তো এক মাসের মধ্যে কলকাতার পাট চুকিয়ে বিশ্বম্ভর চলে যাবে খুলনা। সেখানে তার বাবা মৃত্যু শয্যায়। ছেলেকে পাশে পেলে তিনি খুশি হবেন। ছেলের বউয়ের সেবা পাবেন। এগুলোর সাথে বাড়ির জমি জায়গাও দেখা শোনা করা যাবে। আর ডাক্তারি প্র্যাকটিসটা ঠিক ভাবে চালালে তো আর কথাই নেই। পিল পিল করে লোকজন লাইন দিয়ে দাঁড়াবে দরজার সামনে। যদিও কোন দিন তেমন রোগীর ভিড় হয়নি বিশ্বম্ভরের। তবে স্বদেশী করা এক ডাক্তারকে চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি আশেপাশের গাঁয়ের মানুষদের। যতটা না আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ডাক্তারী করতেন বিশ্বম্ভর তার থেকে বেশী সাহায্য হতো গরীব গুর্বো মানুষ গুলোর। কিন্তু সেসব তো আরও পরের কথা। আপাতত তার সামনে যে নতুন বউটি বসে আছে। একবারের অনুরোধেই খুলে ফেলেছে মাথার ঘোমটা। সেই মেয়েটা কি ভাবছে বোঝার চেষ্টা করছে বিশ্বম্ভর। যদিও এই মুহূর্তে মেয়েটির টানা দুটো চোখ ভরে উঠেছে জলে। আর ভরবে নাই বা কেন? খুলনা জায়গাটা কেমন তার আগে ঠিক ধারণা ছিল না জ্যোৎস্নাময়ীর। ততদিনে তো সে স্বপ্নটা দেখে রেখেছে টেরাম লাইনের পাশে বাসার। খোলা ছাদে রান্নাঘর। একটু দূরে কালীঘাটের মায়ের মন্দির। প্রতি অমাবস্যায় মায়ের মুখ দর্শন। পালা পাব্বনে গঙ্গায় স্নান। রথের মেলা। চড়কে জেলে পাড়ার সঙ। মাথায় আগুন জ্বলতে থাকে জ্যোৎস্নাময়ীর। কাজেই ফুলশয্যায় স্বামীর গায়ের ঘেমো গন্ধের সাথে খাটের রজনীগন্ধা কেমন যেন গুলিয়ে ওঠে। মাঝরাতে দোর খুলে মেয়ে গিয়ে শোয় তার পুতুল ঘরে। নিজের মা থাকলে এমনটি কক্ষোনো করতো না। দিতো অমন ছেলের মুখে নুড়ো জ্বেলে। বিয়ের আগে এক কথা। বিয়ের পরে অন্য? মা মরা মেয়ে বলে তার কোন দাম নেই গো? কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্নাময়ী। ভোর রাতে গা শিরশির করে উঠলে দেখেছিল ওই অতোবড় পুরুষমানুষটা তাকে জড়িয়ে ধরে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে পুতুল ঘরে। কখন উঠে এসেছে খাট থেকে জানেও না সে। ভোরের আলো এসে পড়েছে বিশ্বম্ভরের মুখে। কি সুন্দর

লাগছে। জ্যোৎস্নাময়ীর খুব ইচ্ছে করছিল লোকটাকে ভালোবাসতে। হালকা আলোয় ঠোঁটের ওপর, চোখের পাতায় চুমু খেতে। জ্যোৎস্নাময়ী পারেনি। তখনও মনের মধ্যে কলকাতায় না থাকতে পারার শোক উথালা পাথাল করছিল।

বিশ্বম্ভরের বাবা মারা গেলেন বিয়ের কিছু কালের মধ্যে। ছেলে শ্রাদ্ধ শান্তি করলো বউকে ছাড়াই। জেদ করে থাকলো জ্যোৎস্নাময়ী নবদ্বীপে। একটা চিঠি পাঠালেই তাকে যেতে হবে নাকি? স্বামী হয়েছে তাহলে কিসের জন্য? নিজে এসে নিয়ে যেতে পারে না? জ্যোৎস্নাময়ী বাড়িতেই তার না দেখা শ্বশুরের জন্য ঘাট করলো। নখ কাটলো বাড়ির মধ্যে পাঁচিল ঘেরা পুকুর ঘাটে বসে। পুরোহিত এসে জল দেওয়ালো শ্বশুরকে। ব্রাহ্মণ খেলো। নিয়মভঙ্গের দিন অশৌচ কাটাতে জলঙ্গীতে গেলো বাড়ির পালকি জ্যোৎস্নাময়ীকে স্নান করাতে। বর্ষার জলঙ্গী তখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পালকি শুদ্ধু জ্যোৎস্নাময়ীকে জলে চোবানো হল। এমন শীতল জলে এর আগে কোনদিন সে স্নান করেনি। আর এইভাবে পালকির ঘেরাটোপের মধ্যেও না। তার যেন মনে হল জলঙ্গীর জলরাশির প্রবল চাপে এক অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে পালকিটা। চোখ খোলার চেষ্টা করলো জ্যোৎস্নাময়ী। আর ঠিক তখনি যেন সে দেখতে পেলো বিশ্বম্ভরের শান্ত মুখটা। শিরশির করে ওঠে গা জ্যোৎস্নাময়ীর। এমন শিরশির করেছিল সেই ভোর রাতেও। যখন দুটো শক্ত হাত তাকে পরম মমতায়, ভালোবাসায় জড়িয়ে শুয়ে ছিল পুতুল ঘরে। একটা দেহের ওম যেন আরও একটা দেহে স্পর্শ করছিল। ঘাড়ের কাছে ঘন নিশ্বাসের হলকা লাগছিল যেন জ্যোৎস্নাময়ীর। আর ঠিক সেই সময়ে সারা গা বেয়ে যেন কিসব উঠতে থাকে তার। চিড়বিড় করতে থাকে তারা গোটা গা জুড়ে। কারা যেন আঙুল বোলাচ্ছে তার গায়ে। প্রচন্ড ভয়ে পালকির ভেতরের অন্ধকারে জলের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে যেন তার। চিৎকার কর ওঠে জ্যোৎস্নাময়ী। পালকির বেহারারা বুঝতে পারে পূণ্যস্নান হয়েছে বটে মেয়ের। তারা আবার ডাক ছাড়তে ছাড়তে ঘাট পেরোয়, মাঠ পেরোয়। আর এদিকে দিনের আলোতে জ্যোৎস্নাময়ী দেখে তার পালকির মেঝেতে, কাপড়ের কোচড়ে, শাড়ির আঁচলে জাপটে জড়িয়ে আছে

চিংড়ি মাছের ঝাঁক। কোনটা নড়ছে। কোনটা অল্প জলেই পালকির কাঠের মেঝেতে খাবি খাচ্ছে। ভয়টা কেটে যাচ্ছে জ্যোৎস্নাময়ীর। তাহলে এরাই এতোক্ষণ গায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চিড়বিড় করছিল? কি যেন এক অনাবিল আনন্দে মন ভরে উঠছে তার। কুড়িয়ে বাড়িয়ে আঁচল ভর্তি করছে সে। একটাও চিংড়ি যেন নষ্ট না হয়।

বাড়ি ফিরে দাসীর হাতে আঁচল ভরা চিংড়ি দিয়ে জ্যোৎস্নাময়ী হুকুম দেয়, ওপরে মায়ের ঘরের আমিষের রান্নাঘরটার দোর খোল। পরিষ্কার কর। আমি রান্না করবো। দাসী যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে কি মেয়েটা। আজ শ্বশুরের তেল ছোঁওয়ানি। বাইরে থেকে বামুনরা এসে বসে আছে। মেয়ে পায়ে তেল ছুঁইয়ে গেছে জলঙ্গীতে ডুব দিতে। ফিরে এসে পাতায় তুলে দেবে ইলিশ মাছ ভাপা। গরম ভাত। মাছের ডিমের বড়া। এই যে এতো রান্না করলো ঠাকুর। বিরক্ত হয় জ্যোৎস্নাময়ী। উনুনটা নিকো দেখি। আমি চট করে কাপড়টা ছেড়ে আসি। দাসীর মুখে আর কথা সরে না। যে মেয়ে খায় না দায় না। বাড়ির কারো সাথে কথাটি বলে না সেই মেয়ে উনুন নিকানোর কথা বলছে কেন? আঁচল ভর্তি চিংড়ি মাছও বা কোথায় পেলো? দাসী সময় নষ্ট করে না। রান্নাঘর পরিষ্কার করে। উনুন ধরিয়ে বসে থাকে। জ্যোৎস্নাময়ী নতুন একটা তাঁতের শাড়ি ভেঙে। আলতা পরে। কপালে সিঁদুর দিয়ে রান্না ঘরে ঢোকে। দাসীর মনে হয় যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। তার যেন গড় হয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে হয়।

এই রান্নাঘর ব্যবহার হয় না মোটেই। জ্যোৎস্নাময়ীর মায়ের রান্নাঘর। মা মারা যাবার পর এই রান্নাঘরের পাট উঠছে বাড়িতে নতুন মা আসার পর থেকে। তাও সেটা বছর তিন তো হলোই। তাই জিনিসপত্র বাড়ন্ত থাকে। এই অবেলায় কোথায় বা আর কিছু খুঁজতে যাবে সে? চট করে তাকিয়ে নেয় চারপাশটা। কি আছে আর কি নেই এর হিসেবটা পরিষ্কার হয়ে যায় নিজের কাছে। দাসী সেই কচি চিংড়ি গুলোতে ততক্ষণে মাখিয়ে রেখেছে নুন, হলুদ। জ্যোৎস্নাময়ী লোহার কড়াই উনুনের আঁচে বসায়। অল্প তেলে চিংড়ি গুলোকে

ছেড়ে দেয়। এপিঠ ওপিঠ ভাজা হয়ে গেলে কাঁচা লঙ্কা আর কালো জিরের ফোড়ন দিয়ে জল ঢালে। জলঙ্গীর কচি চিংড়ির গা থেকে বেরোতে থাকে মিষ্টি জলের রস। গোটা বাড়ি কালো জিরের ফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা আর হলুদের সুবাসে ভরে যায়। জ্যোৎস্নাময়ীর বাবা ব্রাহ্মণ বিদায় দিয়ে সবে ছোট পক্ষের রান্নাঘরের পিড়েতে বসতে যাচ্ছিলেন দুপুরের আহার সারতে। কিন্তু তা আর হল না। পঞ্চ দেবতাকে স্মরণ করে প্রথম গ্রাস মুখে নেওয়ার আগেই উঠে এলেন দোতলায় অনেক দিনের বন্ধ রান্নাঘরের সামনে। জ্যোৎস্নাময়ী আন্দাজ করেছিল এমনটাই হবে। আসন পেতে জলের গ্লাস নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সেদিন তার বাবা, মায়ের রান্নাঘরে কতদিন পরে খেতে বসলো। মনে পড়লো বড় বউয়ের কথা। তার হাতের চিংড়ির হলুদ গালা ঝোলের সুবাস। হাপুস হুপুস করে বাবা ভাত খায়। ঝোলের কাঁচা লঙ্কা ডলে। চোখ দিয়ে জল পড়ে তাঁর। সেটা বড় বউয়ের স্মৃতিতে নাকি অনেক দিন পরে পুরনো রান্না খাওয়ার আনন্দে বোঝা যায় না ঠিক। খাওয়া শেষ হলে পান এগিয়ে দেয় জ্যোৎস্নাময়ী। বাবা মেয়েকে আশীর্বাদ করেন। কি চাস মা। একবার মুখ ফুটে বল। সারা বাড়ি কানাকানি হয়। এই বুঝি মেয়ে তার নিজের নামে সব সম্পত্তি চেয়ে নিল। খাওয়া ছেড়ে অন্দরের দোরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে ছোট মা ভয়ে ভয়ে। জ্যোৎস্নাময়ী অস্ফুটে তার বাবাকে বলে, একবার চিঠি লিখুন। তিনি যেন আমাকে এসে নিয়ে যান। কথা গুলো বলেই জ্যোৎস্নাময়ী লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় ঝোলের চিংড়ি গুলোর মতোই। মেয়ে বাড়ি লিখিয়ে নিলো না। জমি জমা সম্পত্তি কিচ্ছুটা না। এমনকি সখের পুতুল গুলোও না। শুধু গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে এলো মায়ের রান্নাঘর। ডেয়ো, ঢাকনা, খুন্তি। আর সেই আমিষের বড় লোহার কড়াইটা। বিশ্বম্ভর বাধা দেয়নি। সে জানতো নতুন সংসার করতে তার সবটাই লাগবে। কোন কিছুই ফেলা যাবে না।

কলমী শাক কিন্তু বোর্ডে লেখা ছিল না দিদা। অনেক গুলো কলমীশাকের আঁটি বাজারের ব্যাগে ভর্তি হবার পর কিংশুক বলে। লেখা ছিল না তো ছিল না। খাবি। সঙ্গে একটু করে না হয় কাসুন্দি দেবো। ইন্দুবালা এগিয়ে যান তড়বড় করে মাছের বাজারটার দিকে। এই যে ধনা...ওই চিংড়ি

গুলো কি তোর বিক্রি হয়ে গেছে? ধনা অনেক দিন পরে দেখলো ইন্দুবালাকে। সেকি গো দিদা? তুমি আজ বাজারে? ধনঞ্জয়দার কি হলো আজ? ইন্দুবালা চিংড়ি গুলো হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বলেন কিচ্ছু হয়নি তার। কি আবার হবে? কেন আমি এসেছি ভালো লাগছে না তোর? ধনা চা আনতে পাঠায়। নিয়ে যাও দিদা সবটা। ভেড়ির নয়কো। ইন্দুবালা চেনেন। কোনটা ভেড়ির চিংড়ি। আর কোনটা নদীর। সক্কাল বেলা একটা বড় গামছা নিয়ে ভাই বোনে চুপি চুপি চলে যেতেন কপোতাক্ষের ঘাটে। ততক্ষণে জড়ো হয়েছে গ্রামের অন্যসব ছেলে মেয়েরাও। ওদিকে আকাশ আসছে কালো হয়ে। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে সেই কবেকার দাঁড়াও পথিকবরের নদী। গামছা জলে ফেললেই উঠছে ঝাঁকের চিংড়ি গুলো। হাতে করে একটা চিংড়ি তুলে মুখের সামনে ধরেন কিংশুকের ইন্দুবালা। কেমন এখনও নড়ছে দেখেছিস? কিংশুক দুপা পিছিয়ে আসে। এমনিতে সে বড় পেটুক। খাবার পেলে সে আর কিছু চায় না। কিন্তু এইসব শাক সবজী মাছ সে বরাবর দেখে এসেছে মরা। জ্যান্ত জিনিস যে এমন হতে পারে সেই অভিজ্ঞতা তার এই ছাত্র জীবনের বাইরে। এই ছোট চিংড়ি দিয়ে বুঝি মালাইকারী হবে? ইন্দুবালা বলে তোর মন্ডু। কেমন হলুদ গালা ঝোল করে দেবো দেখিস। কিংশুক মাথা নাড়ে। ঠিক হচ্ছে না কিন্তু দিদা। বোর্ডে এইসবের কথা লেখা ছিল না মোটেই। ইন্দুবালা বলে কেন মাছের কথা লেখা ছিল না? এই তো হয়ে গেল। চিংড়ি মাছ নিয়ে নিলাম। কিংশুক মাথা চুলকোয়। চিংড়ি আবার মাছ কোথায়? বইতে লেখা আছে ওগুলো জলের পোকা। অনেক দিন পরে যেন ইন্দুবালা একটু হা হা করে হাসেন। বাজারের লোকজন পাশে জড়ো হয়। কী হয়েছে মা হাসো কেন? ইন্দুবালা মাথা নাড়েন। কিচ্ছু না। নাতির কথায় মজা নিচ্ছিলাম। তোমরা তাড়াতাড়ি খেতে এসো সবাই। ফেরার পথে একবার ইন্দুবালা দাঁড়িয়েছিলেন কাশী মুদির দোকানে কালো জিরে কিনতে। বোর্ডটা কিংশুককে দিয়ে মুছিয়ে লেখালেন ভাত, কলমিশাক, চিংড়িমাছের হলুদ গালা ঝোল, বেগুনের টক। অনেক দিন পর বাজার করে এসে প্রসন্ন চিত্তে স্নান করতে গেলেন ইন্দুবালা কর্পোরেশানের তোলা জলে। গায়ে জল পড়তেই পুকুরের ভাবনাটা আবার

মাথায় চাগাড় দিতে শুরু করলো। বাড়ির পেছনের বাগানটার মতো এই বাড়িতেও যদি একটা পুকুর থাকতো? এই একটা ব্যাপার শাশুড়িকে বলার পর মুখ ঝামটা খেতে হয়নি। বাড়ির সেই সময়কার আত্মীয়রা মস্করা করতে এলে মুখের ওপর বলে দিয়েছেন ঠিকই তো বলেছে বউ পুকুর থাকলে কত সুবিধে হতো বল দেখি। নিজের জল বলেও তো কিছু একটা থাকতো। তা ও বউ তোমাদের গ্রামের বাড়িতে কি পুকুর আছে? উত্তর দিতে পারতেন না ইন্দুবালা। তিনি জানেন নেই বললেই তার শাশুড়ি মস্করা করতে ছাড়বেন না। আর মিথ্যে কথাও এই বুড়ো মানুষটাকে বলা যায় না। সন্ধ্যে দেবার অছিলায় উঠে পড়তেন তিনি। কথা আর এগিয়ে যাওয়ার পথ পেতো না।

জ্যোৎস্নাময়ীর কোন ছবি ইন্দুবালা দেখেননি। একমাত্র ফ্রেমে উঁইয়ে কাটা আলতা রাঙানো পায়ের দুটো ছাপ ছাড়া। ঠাম্মা সেখানেই চন্দন দিতো। সন্ধ্যে দেখাতো। তার শাশুড়ি শিখিয়ে দিয়েছিল নাকি এইসব। আর মাঝে মাঝে সেই লোহার কড়াই সিন্ধুক থেকে বেরোলে গল্প হতো জ্যোৎস্নাময়ীর। কই রে ইন্দু নিয়ে আয় হলুদের কৌটোটা। ঠাম্মা হাঁক পাড়ে। বেলা যে অনেক হলো। ভাইকে পাঠায় পাশে ভবেশদের বাড়িতে কাঁচা লঙ্কা আনতে। ইন্দুবালারা গামছা দিয়ে যে চিংড়ি ধরেছে সেগুলো দিয়ে আজ ঠাম্মা রান্না করছে চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল। কিন্তু এই গল্পের সাথে বাড়িতে পুকুর না থাকার কি সম্পর্ক? প্রশ্ন করে ইন্দুবালা। দাও দেখি আমি একটু নাড়ি ঝোলটাকে। ইন্দুবালা ঠাম্মার হাত থেকে খুন্তিটা নিয়ে নাড়তে থাকে এদিক থেকে ওদিকে ঝোলটাকে। চিংড়ি গুলো সেই হলুদ ছোপা ঝোলে কেমন যেন ডুব সাঁতার দিতে দিতে ভেসে ওঠে। ওই দেখো না শেফালীরা কি সুন্দর বাড়ির পুকুরেই জারিয়ে রাখে মশারির জালে চিংড়ি গুলো। মনিরুল তো আরও বুদ্ধি করে পাটকাঠি দিয়ে সরজাল করে। অল্প অল্প করে পুকুরের মধ্যেই জমায় মাছ গুলো। তারপর একদিন চিংড়ি খাওয়ার উৎসব হয়। আর তুমি কিনা মাটির হাড়িতে জারিয়ে রাখতে বলো চিংড়ি গুলোকে? ওই টুকু হাড়িতে আর কতটুকুই বা ধরে? একদম ভালো লাগে না ইন্দুবালার। বোসদের মতো যদি তাদেরও একটা পুকুর থাকতো। নয়তো শেফালীদের মতো অন্তত একটা

ডোবা। কি মজাই হতো তাহলে? টগবগ করে ফুটতে থাকা ঝোলে আরও দুটো লংকা দিয়ে ঢাকনা দেয় ঠাম্মা। পুকুর নেই বলে তার নাতনির বড় দুঃখ। তারও যে ছিল না তেমটা তো নয়। পুকুর হলো গেরস্থের লক্ষ্মী। মাছটা, শাকটা, জলটা তা থেকে যেমন পাওয়া যায় ঠিক তেমনই চাপড়া ষষ্ঠীতে কাঁঠাল পাতায় সিন্নি ভাসাতে। ইতু পুজোয় ঘট বিসর্জন দিতে। বাস্তু পুজোয় জল পুজো করতে। বিয়েতে জল সইতে একটা নিজের পুকুর থাকবে না তাও কী করে হয়? কিন্তু ওই যে অদৃষ্ট। যাও তোমার কাছে আর কোন গল্প শুনবো না। চিৎকার করে ইন্দুবালা। তার ভাইও ঠাম্মার আঁচল ধরে বলে, দিদি কাঁদছে ঠাম্মা। বলো না পুকুরের গল্পটা।

জ্যোৎস্নাময়ীও কাঁদতো সারাক্ষণ। এই নদী নালার দেশে বর্ষাকালে সংসার পাততে এসে চোখের জলে নাকের জলে হচ্ছিল সে। নবদ্বীপে ছিল বাবার পাকা বাড়ি। লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। আর খুলনার অজ গাঁ কোলাপোতাতে শ্বশুরের মাটির বাড়ি। মাটির দাওয়া। উঠোন ভর্তি পাশের বাড়ির পুকুরের জল। সাপে কামড়ানোর সব ভয়ানক গল্প। লম্ফ জেলে কোন রকমে রান্না করে জ্যোৎস্নাময়ী। সন্ধ্যে হতে না হতেই বেড়ার দিকে উঠোনের শেষভাগে কাদের যেন চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। ওরা কি সব ভূত প্রেত? পাশের বাড়ির বিধবা বউ রাধারানী এসে বলে যায়, মোটেই না। ওগুলো সব শেয়াল। সন্ধ্যে হতেই খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সাবধানে থেকো বউ ওরা পারলে মানুষ তুলে নিয়ে যায়। আঁতকে ওঠে জ্যোৎস্নাময়ী। বিশ্বম্ভর অনেক রাতে রোগী দেখে একা একা বাড়ি ফেরে। তাঁর যদি কিছু হয়ে যায়? শেয়ালে যদি ধরে। সাপে যদি কাটে। চিন্তায় চিন্তায় কেমন যেন শুকিয়ে যেতে থাকে জ্যোৎস্নাময়ী। এইদিকে বর্ষা গিয়ে শরৎ আসে। শরৎ গিয়ে হেমন্ত। শরীর ঠিক হয় না তার। গাঁয়ের লোক বলে হাওয়া লেগেছে বউয়ের। পীরের কাছে যাও। বিশালক্ষ্মী তলায় মাঝে মাঝে আসে কত পীর। কত সাধু সন্ন্যাসী। এদের একটুও বিশ্বাস করে না বিশ্বম্ভর। যত বুজরুকি। কিন্তু জ্যোৎস্নাময়ীর মন চায় একবার অন্তত যাক সে। এতোদিনে পেটেও তো এলো না কোন সন্তান। কেন? কোন কারণে? এরমধ্যে গ্রামে এলো এক জল বাবা। কতশত

পাহাড় ডিঙিয়ে। অনেক মন্ত্র তন্ত্র পড়ে। সে নাকি জলে মুখের ছায়া দেখে সব বলে দিতে পারে। রাধারানীই দিলো খবরটা ইন্দুবালাকে। তাজ্জব সব কথা বলে নাকি লোকটা। দরকার পড়লে বাঘে গরুতেও এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে। একদিন বিশ্বম্ভর যখন সদরে গেছে ওষুধ কিনতে জ্যোৎস্নাময়ী পাশের বাড়ির রাধারানীর সাথে বেরিয়ে পড়লো। বিশালক্ষ্মী তলায় সেদিন ভিড় ছিল কম। বেদীর ওপর বসে এক ভিন দেশের সাধু। তিনি অনেকক্ষণ ধরে জ্যোৎস্নাময়ীকে দেখলেন। পেতলের সরার মধ্যে জল নিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে মুখাবয়ব দেখলেন। আর তাকে চমকে দিয়ে নানা রকমের কথা বলতে শুরু করলেন। যেমন তার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল বাড়ির মধ্যে পুকুর পাড়ে বজ্রাঘাতে। দিনটা ছিল সোমবার। এটা একমাত্র জ্যোৎস্নাময়ী ছাড়া এই গ্রামের কারোর জানার কথা নয়। এমনকি বিশ্বম্ভরকেও সে কোনদিন গল্প করেনি। সাধু ভুরু নাচিয়ে বলে নদীতে স্নান করার সময় গায়ে উঠেছিল চিংড়ি। আঁতকে ওঠে জ্যোৎস্নাময়ী। সব সত্যি যে। সাধু জানতে চায়, বল কি দিবি? নিদান বলে দেবো। সব বিপদ কেটে যাবে। জ্যোৎস্নাময়ী হাতের বালা খুলে দিয়েছিল। সাধু খুশি হয়ে বলেছিল তোর বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে উপছায়া। পাপ। বাড়িতে একটা নতুন প্রানের সঞ্চার কর যাতে অন্য নতুন প্রাণ আসতে পারে। এই নতুন প্রাণটা কি হতে পারে সেটা বুঝতে পারে না জ্যোৎস্নাময়ী। স্বামীকেও বলা যায় না। যদি শোনেন সাধু সন্তের কাছে যেতে শুরু করেছে তার বউ তাহলে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। রাধারানী একদিন দুপুরে পান খেতে এসে বুদ্ধি দেয়। যদি বউ বাড়িতে একটা নতুন ডোবা করিস। সেটাও তো একটা নতুন কিছু করা হয়। বুদ্ধিটা ফেলতে পারে না জ্যোৎস্নাময়ী। স্বামীকে বলে। অন্যের পুকুরে যেতে তার বড় সমস্যা। কেমন লজ্জা লজ্জা করে। নিজের বাড়িতে যদি একটা পুকুর থাকতো। নিদেন পক্ষে একটা ডোবা। বিশ্বম্ভর রাজী হয়ে যায়। তারও অনেক দিনের শখ নিজের বাড়িতে একটা পুকুরের। জলাশয় শুভর প্রতীক। কল্যাণকর। পুকুর কাটানোর দিনক্ষণ দেখা হয়। সে মহা ঝক্কির ব্যাপার। এতোসব জানতো না জ্যোৎস্নাময়ী। ভূমিকে পুজো করে। পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ নিয়ে প্রথম মাটি

কাটা হয়। এক দিনেই অনেকটা মাটি গোল করে কেটে ফেলে লোকজন। বাড়ির চারপাশটা যেন মেলার মতো মনে হয়। সেদিন হঠাৎ রাতে বৃষ্টি নামে। কড়কড় করে বাজ পড়ে। আর সে কি ঝড়। অনেক ভোরে জ্যোৎস্নাময়ীর ঘুম ভেঙে যায়। পাশ ফিরে দেখে বিশ্বম্ভর অকাতরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ যেন তার মনে হয় জলের কল কল আওয়াজ। প্রথম দিনের পুকুর কাটাতেই ভর্তি হয়ে গেল নাকি? জল দেখতে উঠে পড়ে জ্যোৎস্নাময়ী। আধ খোড়া পুকুরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। কোথায় জল? শুকনো খটখটে মাটি। আর সেই হাঁ করা বিশাল মাটির গর্তে পড়ে আছে সাদা থান পড়া পাশের বাড়ির বিধবা রাধারাণী। যার মুখের এক দিকটা খুবলে নিয়ে গেছে শেয়াল। বাতাস ভারী হতে থাকে। ফিসফিস করে যেন কারা কথা বলে চারপাশে। পেছন ফিরতেই জ্যোৎস্নাময়ী দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কবেকার মরে যাওয়া তার মৃত মা। জানতিস না খুকু পুকুর ঘাটে বজ্রাঘাতে মরণ হয়েছিল আমার। আঁতকে ওঠে জ্যোৎস্নাময়ী। চোখ মেলে দেখে ঘুমোচ্ছিল সে। পাশে বিশ্বম্ভর নেই। বিভৎস স্বপ্নের রেশ নিয়ে দালানে এসে বুঝতে পারে কাজ বন্ধ রেখেছে মাটি কাটাইয়ের লোকেরা। পাশের বাড়ি থেকে কান্নার সুর ভেসে আসছে। বিধবা রাধারানী ভোরবেলায় মারা গেছে ভেদ বমিতে। পুকুর কাটানো বন্ধ করে দিল বিশ্বম্ভরের গাঁয়ের লোকজন। বাধা পড়েছে কাজে। মাটি কাটার লোকগুলোও ফিরে গেল। তারও অনেক পরে বাড়ির পুব দিকে বিশ্বম্ভর একটা কুয়ো খনন করেছিল। ততদিনে অবশ্য তার ছেলে মেয়েতে সংসার ভরে উঠেছে। এই গ্রামে সেই প্রথম কুয়ো। যে কুয়োতে ইন্দুবালার ভাই একটা কচ্ছপ পুষেছিল। নাম রেখেছিল কুমড়ো। ওপর থেকে মুড়ি দিলে কুমড়ো ভেসে উঠতো। ছোট্ট হাঁ করে জলে ভেজা মুড়ি গুলো গিলে গিলে খেতো। ঠাম্মার কুর্মো অবতারের গল্প হয়তো মনে ছিল তার। সবাই আজ একটু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আসে। বাবা, ইন্দু, ভাই। মাকেও বসে যেতে বলে ঠাম্মা। গরম ভাতের সাথে আজ যে শুধু চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল সেই কবেকার গল্প হয়ে যাওয়া জ্যোৎস্নাময়ীর লোহার কড়ায়।

লোহার কড়াই ইন্দুবালার হোটেলেও আছে। কিন্তু জ্যোৎস্নাময়ীর

মায়ের কড়াইয়ের মতো নয়। তিনি যদি তার মায়ের সব বাসন গুলো নিয়ে আসতে পারেন তাহলে ইন্দুবালাই বা পারবেন না কেন? লছমী তার চোখ গোল্লা পাকিয়ে বলেছিল হাঁ ঠিকই তো লিয়ে আসলি না কেনো ওইগুলা? ইন্দুবালা হাসেন। তখন কী করে জানবেন এই এত্তোবড় হোটেল হবে তার? লছমী বলে এক মাছওয়ালী বন্ধু হবে। তিন তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে অকালে বিধবা হবেন? আর কোথাও কোনদিন যাওয়ার জায়গা থাকবে না।

এমনকি বাপের বাড়িও না। থম মেরে বসে থাকেন ইন্দুবালা। কিন্তু আজ লছমীও বা কোথায়? কেউ কোত্থাও নেই। আর যখনই মনে হয় কেউ নেই তখন যেন আর শরীর চলে না ইন্দুবালার। কিন্তু ইন্দুবালার ওপর ওয়ালা একজন আছেন। তিনি বাতাসের সাথে ভেসে ভেসে বেড়ান। গরম তেলের ওপর কালো জিরের ফোড়ন পড়তেই চড়বড় করে ওঠেন তিনি। রান্নার নানা রকমের সুবাস পাঠিয়ে লোক জড়ো করেন। ইন্দুবালার তখন আর একা থাকা হয় না। কিংশুক হোস্টেল উজিয়ে ছেলে মেয়ের দলকে তো নিয়ে এসেছেই। চিংড়ি মাছের হলুদ গালা ঝোল খেতে সেই কতদূর থেকে ডাক্তার হোস্টেলের ছেলে মেয়ে গুলোও এসেছে। তাদের মধ্যে কলমিশাক বিক্রি করা বউটাও ছিল। কাসুন্দি দিয়ে কলমি শাক মাখার সময় ইন্দুবালা তার চোখে জল দেখেছেন। আহা...ওরও বড় পুকুরের শখ ছিল গো ঠিক ইন্দুবালার মতোই। ওর যেন একটা বড় পুকুর হয় এই মনস্কামনা করার সাথে সাথেই মেঘ ডেকে উঠলো। মুষল ধারায় বৃষ্টি নামলো। রেডিওতে এক ছোকরা জকি দু কলি গান শুনিয়ে বললো অবশেষে বর্ষা নামলো শহরে। ইন্দুবালা বিকেলের উঠোনে ঠায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজলেন। মনে হল তাঁর সাথে যেন ভিজছে গ্রামের ভিটেখানাও। ভিজছে পুইয়ের মাঁচা, ডালিম গাছ, গন্ধরাজ লেবু, কালনার আতা, নারকেল গাছে জড়িয়ে ওঠা চুইঝাল। এখনও সেখানে জল থৈ থৈ করে কিনা কে জানে? গামছা দিয়ে কেউ কি আর চিংড়ি মাছ ধরে? তার হলুদ গালা ঝোল হয়? বৃষ্টির জলে ডুব দিতে থাকেন ইন্দুবালা অনবরত। মনে মনে প্রার্থনা করেন এই ডুবের যেন শেষ না হয় ঠাকুর। কোন দিন শেষ না হয়।

সাত

চন্দ্রপুলি

ধনঞ্জয় বাজার থেকে এনেছে গোটা দশেক নারকেল। কিলোটাক খোয়া ক্ষীর। চিনি। ছোট এলাচ আনতে ভুলে গেছে। যত বয়েস বাড়ছে ধনঞ্জয়ের ভুল হচ্ছে ততো। এই নিয়ে সকালে ইন্দুবালার সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে। ছোট খাটো ঝগড়াও। পুজো এলেই ইন্দুবালার মন ভালো থাকে না। কেমন যেন খিটখিটে হয়ে যায়। পইপই করে ধনঞ্জয় বলেছিল মেয়ে ডাকছে এতো করে ঘুরে এসো। ইন্দুবালার ছোট মেয়ে থাকে ব্যাঙ্গালোরে। এবছরেই তাদের সেখানকার পাট উঠবে। জামাই চলে যাবে ইউক্রেনে। মেয়ে তার ছেলেপুলে নিয়ে এসে উঠবে দিল্লী। শ্বশুর বাড়িতে। তারপর সেখান থেকে সোজা স্বামীর কাছে। তাই ওরা বারবার বলছিল একবার আসতে। একটু থেকে যেতে তাদের সংসারে। কিন্তু ইন্দুবালা ছেনু মিত্তির লেনের এই বাড়িটা ছেড়ে কোথাও কোনদিন যাননি। তাঁর যাওয়ার জায়গাও ছিল না। চিলেকোঠার ছাদ থেকে বাড়ির পেছনের বাগান। হোটলের রান্নাঘর। খাবার ঘর। রাস্তার ওপারে কাশির মুদির দোকান। বড়জোর সকালের রেল লাইনের পাশের বাজার। এইটুকু ভৌগোলিক আলোছায়ার মধ্যে ইন্দুবালা নিজেকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলেন। কেন রেখেছিলেন? বাইরে যেতে ভয় করতো কি তাঁর? মোটেই না। ফুরসত পেতেন না অন্য কোথাও যাওয়ার। প্রাপ্ত বয়েস না হওয়া পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদেরও কোথাও যেতে দেননি তিনি। আগলে রেখে ছিলেন কঠিন কঠোর শাসনে। কারণ তিনি জানতেন এই মল্লিক বাড়ির রক্ত খারাপ। একটু আলগা দিয়েছো কি সবাই মাষ্টার রতন লাল মল্লিক তৈরী হবে। ইন্দুবালা তাই তাঁদের কবেকার খুলনার বাড়িতে বসা দাদুর টোলটাকে ওপরের ঘরে গড়ে তুলেছিলেন নিজের মতো করে। ছোট ছোট বাচ্চা গুলোকে নিয়ে এক পুব বাংলার বিধবা যখন হোটেল চালাচ্ছে তখন তাঁর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে

কচি গলায় পড়ার আওয়াজ। “ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগনী রঙের শাড়ি...চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই...তেপান্তরের পার বুঝি ওই...”। বড় ছেলে হ্যারিকেনের আলোয় পড়ছে সহজ পাঠ। মেজো ছেলে শ্লেটে লিখছে অ আ ক খ। ছোট মেয়ে কাঁথায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে অকাতরে। জাগলেই দাদারা কেউ না কেউ তাকে দুধ খাইয়ে দেবে। আর ইন্দুবালা তখন দুটো গনগনে উনুনের সামনে। কোনটাতে ফুটছে সোনা মুগের ডাল। কোনটাতে বা ভাত। বোনকে বেশ খানিকটা বড় করে তুলেছিল দাদারাই। তাই বোন মায়ের থেকেও দাদাদের ন্যাওটা বেশি। সেই ছোট থেকেই। দাদারাও বোন বলতে প্রান। তিনজনের বড় হয়ে ওঠাটা একে অন্যকে অবলম্বন করে। তার মাঝে খাড়া হয়ে বট গাছের মতো আছে যেন মা। ঝুড়ির সাথে বট গাছের যেমন সম্পর্ক ঠিক তেমনি ছিল ওর ছেলে মেয়েরা। মা আছে জানলে ওরা নিশ্চিন্ত হত। আর ইন্দুবালা নিশ্চিন্ত হতেন ওদের সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখে। খুব যে হুজ্জুতি ওরা করতো তেমনটা নয়। সেই সময়ও ওরা পেত না। ছোট থেকেই ওরা জেনে এসেছে ওদের মা বাবা একজনই। আর তিনি হলেন ইন্দুবালা। যার আবার একটা হোটেল আছে। সেই হোটেল না চললে ওদের ভাতও জুটবে না। কেমন করে যেন ফুস মন্তরের মতো কানে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন ইন্দুবালা। তাই ছোট থেকেই ওদের চাহিদা ছিল খুব কম। মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যেতেন ইন্দুবালা। ওরা যখন একটু একটু করে বড় হচ্ছিল ওদের দেখে ইন্দুবালার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়তো। নিজেও তো ভাইকে একদিকে দিদি আর এক দিকে মায়ের মতো বড় করে তুলছিলেন। তবুও যেটুকু স্নেহ পরশ শীতের হিমের মতো তাঁদের গায়ে লেগে থাকতো এই বাচ্চা গুলোর কপালে তা জোটেনি। সেই স্নেহ কোমলতা ইন্দুবালা নিজের শরীরের অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কখনও কোন দুর্বলতার মুহূর্তেও তিনি প্রকাশ করেননি।

ইন্দুবালাকে কোনদিন কাঁদতে দেখেনি তাঁর ছেলে মেয়েরা। যেটা মুখ দিয়ে বলেছেন সেটাই করেছেন। যা চেয়েছেন সেটাই করতে হয়েছে ছেলেমেয়েদের। ছোট থেকে তাই বড় অনুশাসনে মানুষ হয়েছে তারা। পান

থেকে চুন খসার জো ছিল না। নিয়মিত স্কুলে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন ইন্দুবালা। বাড়িতে রেখেছিলেন পড়ানোর জন্য মাষ্টার। ছেনু মিত্তির লেনে পুব দিকে যে স্কুলটা আছে সেটা নাকি সরকারী। ওখানে টাকা পয়সা তো লাগেই না তার ওপরে আবার দুপুর বেলা চাড্ডি খেতে দেয়। ওই স্কুলের এক অঙ্কের স্যার মাঝে মাঝেই ইন্দুবালার হোটেলে ভাত খেতে আসতেন। ইন্দুবালা তার কাছ থেকে সব নিয়ম নীতি শুনে স্কুলে চলে গিয়েছিলেন নিজেই। দুই ছেলেকে সেই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। ছেলেদের হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন ঘরের কাজ। রান্না-বান্না। কাপড় কাচা। বাসন মাজা। ধনঞ্জয়ের সহ্য হতো না। ওই টুকু ছোট ছোট হাতে ছাই ঘাঁটবে মা? ইন্দুবালার জবাব ছিল, না হলে পদ্ম হবে কী করে? ইন্দুবালা ছেলে মেয়েদের সামনে যে কঠোর কঠিন অনুশাসন রেখেছিলেন আমাদের বাঙালী ঘরে সেটা বড় একটা দেখা যায় না। কেন এমন কঠোর হয়েছিলেন ইন্দুবালা? কেমন এমন কঠোর হয়েছিলেন ইন্দুবালা? তাঁকে তো এমন অনুশাসনের মধ্যে বড় হতে হয়নি। একটা নয় একাধিক কারণ এর পেছনে ছিল। তিনটে নদী পেরিয়ে তিনি যেদিন কলকাতায় এসে এই মল্লিক বাড়িতে ঢুকেছিলেন সেদিন থেকেই বুঝেছিলেন তার ভাগ্য কলাপোতায় যেমন টিমটিম করে জ্বলছিল এখানে এসে বুঝি তা নিভলো। কলকাতার বাবুরা বিকেলে গলায় পাওডার মেখে তাস পেটায়। রাতে বউ পেটায়। ভোর রাতে সোহাগ করে। আর গোটা দিন পাশ বালিশ বুকে জড়িয়ে ঘুমোয়। কিম্বা চিৎপুরের কোন বাড়িতে মাছের তেল চচ্চড়ি খেয়ে গা মালিশ করায়। ইন্দুবালার এই বাড়িতে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা ছিল। জীবনের নানা চড়াই উতরাই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে ইন্দুবালাকে করে দিয়েছিল ক্ষত বিক্ষত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি কোন দিন কোন সন্তান আসে তাঁর জীবনে এই বাড়ির কোন পুর্ব পুরুষের ছায়া তিনি তাদের ওপর পড়তে দেবেন না। বড় ছেলে যখন পেটে শাশুড়ি তখন সবে তার চলৎ শক্তি হারাতে বসেছেন। তাও তাঁর খানদানি মেজাজে তখনও বয়সের জঙ পড়েনি। নাতির মুখ যে বুড়ি দেখতে পাবে সেই আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন তিনি। কাজেই বাড়িতে পিতৃ পুরুষের মুখে জল দেওয়ার লোক এসেছে শুনে তিনি আহ্লাদিত হয়েছিলেন।

কিন্তু নাতিকে তেল মাখানো ছাড়া বড় বেশী সোহাগ করার সময় পাননি। মেজো ছেলে যখন হল শাশুড়ি বিছানা নিলেন। আর ছোট মেয়েকে দেখে যাওয়ার অবকাশ তাঁর হয়নি। যে বাড়িতে মা ষষ্ঠী বিরূপ বলে দোজবরে ছেলের আবার বিয়ের দিয়ে ছিলেন সেই বাড়ির উঠোন জোড়া বাচ্চাদের কলকাকলি তাঁর শুনে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু মনে মনে এক পরম শান্তির গিঁট দিয়েছিলেন তিনি। এক গুষ্টি ঘটির মাঝে এক বাঙাল মেয়ে নিয়ে আসার দুর দর্শিতার বাহবা দিতে দিতে বুড়ি চোখ বুঁজেছিলেন। মাষ্টার রতন লাল মল্লিক পরলোকে গিয়েছিলেন তারও কিছুদিন পরে। ইন্দুবালা নিজে হাতে মুখাগ্নি থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধ শান্তি তো করে ছিলেনই। এমনকি এখনও পর্যন্ত প্রত্যেক মহালয়ায় বাড়িতে পুরোহিত ডেকে বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির লোকদের জলের ব্যবস্থা করেন। নিজে দিতে পারেন না বলে পুরোহিতকে দিয়ে দেওয়ান। ছেলে মেয়েদের সেই দিকে ঘেষতে দেন না একটুও। বড় হলেও না। এই নিয়ে তাদের অনেক প্রশ্ন ছিল। সব জবাব থেমে যেত ইন্দুবালা যখন বলতেন আগে মরি তারপর নিজেরাই সব সামলিও। বড় হয়ে মল্লিক বাড়ির শেকড়ের উৎস সন্ধানে নিজেরা যখন আগ বাড়িয়ে গেছে তখন হোঁচট খেয়েছে বারে বারে। তখন বুঝতে পেরেছে তারা কেন তাদের মা বাড়ির চারপাশের জমাট অন্ধকার থেকে এইভাবে দূরে রেখেছে। কেন তাদের কাছে স্বপ্নের মতো হয়ে উঠেছে খুলনার কোন এক অখ্যাত অজ গাঁ কলাপোতা। বাবার থেকে তারা না দেখা মামার বাড়ির গ্রামটাকে যেন বেশি করে চেনে। মাষ্টার রতনলাল মল্লিক তাদের কাছে বাবা হিসেবে কাগজে কলমে পরিচয় আর ছাড়া আর কিছুই না। মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার মতো কোন কোন বদ দূর সম্পর্কের শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় এসে সম্পত্তি বাগাতে চেষ্টা করেছে। ছেলে মেয়েদের উস্কিয়ে দিয়েছে। ইন্দুবালা নিজে সেইসব ফাটল মেরামতি করেছেন। এখানে এইগুলো হয়তো বিস্তারে বলা যেতে পারতো তাহলে আর পাঁচটা ঘরের কুট কচালির মতো হতো ব্যাপারটা। লাউয়ের খোসায় পোস্ত দিয়ে ভাজার স্বাদটা আর থাকতো না। গরম ভাতও হয়ে যেত জিরুনো। ছোট থেকে বাচ্চারা এই ছেনু মিত্তির লেন ছেড়ে বেরোয়নি খুব

একটা। বাবা বাছা করে আদর করেনি তাদের কেউ। মামার বাড়ি থেকে আসেনি তাদের জন্য কোনদিন পুজোর জামা। কিম্বা বাবার দিকের কোন কুটুম পয়লা বৈশাখে পাঠায়নি মিষ্টির হাঁড়ি। অথচ তারা জানতো খুলনা বলে একটা জায়গা আছে। কলাপোতা বলে একটা গ্রাম। সেই গ্রামে একটা বড় উঠোন ওয়ালা বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে একটা তুলসী মঞ্চ আছে। কপোতাক্ষ নদীর পাড়ে আছে মায়ের স্কুল। একটা নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাংলা ভাষার জন্য তাদের মামা, দিদা সবাই শহীদ হয়েছে। তাদের মা শহীদ পরিবারের মেয়ে।

আদর আহ্লাদে ইন্দুবালা বড় করেননি ছেলে মেয়েদের ঠিকই। তাই বলে ভালোবাসা ছিল না বললে কথকের পাপ বাড়বে। ইন্দুবালার ভালোবাসা সেই ছোট্ট থেকে ছেলে মেয়েরা বুঝে গিয়েছিল অন্যরকম ভাবে। তাদের জন্য বড় বড় বয়ামে, কাচের শিশিতে, এ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় ইন্দুবালা যত্ন করে কত কিছু যে খাবার করে রাখতেন। কোনটাতে নাড়ু, কোনটাতে মুড়ির মোয়া, চিড়ে ভাজা, কুচি নিমকি, গজা। আরও কত কি যে। আজ তা নিজেও মনে করতে পারেন না। বড় ছেলে যেবার কলেজের পরীক্ষা দিল সেবার নিজে গিয়ে কালীঘাটের মায়ের কাছে পুজো দিয়ে এসেছিলেন। বলে এসেছিলেন কোনদিন নিজের জন্য তিনি কিছু চাননি কিন্তু ওকে দাঁড়াবার জায়গাটুকু করে দিও মা। ছেলে ভালোভাবে পাশ করেছিল। শুধু তাই নয় ভালো একটা কলেজে পড়তেও গিয়েছিল সে। ইন্দুবালা জানতেন একটাকে দাঁড় করাতে পারলে বাকি গুলোও ঝপঝপ করে দাঁড়িয়ে পড়বে। তাই হয়েওছিল। বড় ছেলে প্রথম চাকরীর মাইনেটা মাকে দিতে এলে ইন্দুবালা খুশী হয়েছিলেন মনে মনে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেননি। টাকা তো তিনি নেননি। বরং ছেলের বিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিয়েছিলেন। বাকি দুটো কথা শোনাতে এলে ইন্দুবালা তাদের মুখের ওপর সোজা সাপটা বলে দিয়েছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এবার নিজেদের পথ দেখতে হবে। তাঁর চারপাশে থেকে ভিড় বাড়ানো বরদাস্ত করবেন না তিনি। বড় রুক্ষ মনে হয়েছিল সেদিন কি ইন্দুবালাকে? তাতো হয়েছিলই। কিন্তু তিনি জানতেন প্রথম থেকে দূরে না সরালে আর কোনদিনই যে ওরা

নিজেদের গুছিয়ে উঠতে পারবে না। নিজের সংসার হবে না। মাথা গোঁজার জায়গাও। আস্তে আস্তে বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল ইন্দুবালার। জীবনটা তো তারও অনেকদিন আগেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল তার। ধনঞ্জয় শাপ শাপান্ত করলো। কেমন মা তুমি? ছেলে মেয়েদের দূর করে দিলে? মরার সময় জল পাবে না দেখে নিও। ভর সন্ধ্যে বেলায় ধনঞ্জয়ের কথাটা বড় বুকে বেজেছিল। কিন্তু ইন্দুবালা জানতেন তাঁর দুই কূলে কেউই মরার আগে জল পায়নি। তিনও যে পাবেন সেই আশাও করেন না। ইন্দুবালা তাই কালো তিলের সাথে গঙ্গাজল দেন প্রতিবছর। পিতামহ থেকে শুরু করে মাতামহ শ্বশুর বাড়ির তিনকূলের কেউই বাদ পড়ে না। এমনকি মনিরুল...সেই কবেকার একাত্তরের যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া নিজের প্রথম প্রেমকে পর্যন্ত সারাদিন নির্জলা থেকে ইন্দুবালা জল দেন। মনটা ঝুপ করে খারাপ হয়ে যায়। ধনঞ্জয় সেটা বুঝতে পারে। বিরক্ত করে না তখন সে ইন্দুবালাকে। নিজে নিজে উনুন ধরায়। সবজী কাটে। আটা মাখে। ইন্দুবালা নীচে নামেন অনেক দেরী করে। মহালয়ায় ইন্দুবালার হোটেলের মেনু সাদা তিলের বড়া, নারকেল ডাল, কুচো মাছের চচ্চড়ি আর চালতার চাটনি। মেসের ছেলে মেয়েগুলো হাপুস হুপুস করে খেয়ে আঙুল চাটতে চাটতে শুতে যায়। চাঁদপানা মুখ গুলো আবার কয়েকদিন দেখতে পাবেন না ইন্দুবালা। কেউ জড়িয়ে ধরে। কেউ চুমু খায়। কেউ সেলফি তোলে। দিদাকে তারা নাকি খুব মিস করবে। ভালো থেকো তুমি। আর পুজোয় একদম ভালো ভালো রান্না করো না। তাহলে ওই ধনাদাই সব খাবে। কত কি সব কলবল করতে করতে বেরিয়ে যায়।

কিচ্ছুটি মুখে না দিয়ে ইন্দুবালা ওপরের ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসেন। কাদের জন্য তাঁর আজ এতো ফাঁকা ফাঁকা লাগে? সব্বাইকে নিয়ে থাকলে আজ এই নিশুতি রাতে এই বাড়ি গমগম করতো। কোন ঝগড়া নেই। ঝাঁটি নেই। মনের কোন মালিন্যতা নেই। তবুও ছেলে মেয়ে গুলোকে এতো দূরে সরিয়ে রেখে কি পেলেন তিনি? একা বাঁচার সুখ? কার জন্যে একা হয়ে গেলেন তিনি? বাবার জন্যে? মনিরুলের জন্যে? মাষ্টার রতনলাল মল্লিকের জন্য? নাকি অলোকের জন্য? দম বন্ধ হয়ে আসে তাঁর। ঠিক এইরকম সময়ে

ইন্দুবালার যেটা হয় তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। কাজ করতে হয় তাঁকে। মনে পড়ে যায় দশটা নারকেলের কথা। কিলোটাক ক্ষোয়া ক্ষীর। ধনঞ্জয় মাঝরাতে শুনতে পায় খড়খড় আওয়াজ। ঘুম থেকে উঠে দেখে নারকেল কুরছেন ইন্দুবালা। খিঁচিয়ে ওঠে ধনঞ্জয়। নিজে তো শান্তি পাবেই না। আমাকেও শান্তি দেবে না তুমি? ইন্দুবালা মুখ না তুলেই বলেন তুই শুতে যা ধনঞ্জয়। আর যাওয়ার সময় রান্না ঘরের দোরটা দিয়ে যা। ধনঞ্জয় যেতে চায় না। কাল সকালে এইসব নিয়ে বসলে হোত না? এই এতো গুলো নারকেল এখন কুড়বে? বাটবে? তার চেয়ে যাওনা ছেলে মেয়েরা পুজোয় কত কি পাঠিয়েছে সেগুলো দেখো না। ঘুম না এলে সেলাই ফোড়াই করো। ইন্দুবালা খুব শান্তভাবে তাকান ধনঞ্জয়ের দিকে। এই সময়ে তাঁর একটুও ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না। আমি কী করবো না করবো সব তুই বলে দিবি নাকি ধনা? ইন্দুবালার এই চাহনি ধনঞ্জয় চেনে। মনে যা ভেবেছে তাই করবে। সে দাঁড়ায় না। দোড় এঁটে চলে যায়।

চন্ডীমন্ডপে অধিবাসের ঘট বসে গেছে। মহালয়াতে পুজোও হয়েছে কাঁসর ঘন্টা পিটিয়ে। কিন্তু কুমুদ পালের তখনও চোখ আঁকা হয়নি মা দুর্গার। তার ছানাপোনাদের। অনেকের সাথে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ইন্দুবালাও চন্ডীমন্ডপে থামের সামনে। টিমটিম করে জ্বলছে হ্যারিকেন। কুমুদ পাল তোরজোড় করছে কাজ শুরু করার। ঠিক সেই সময়ে কেউ একজন খোঁচা মারে ইন্দুবালাকে। সে বিরক্ত হয়। পেছন ফিরে দেখে অতসী। স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। তারই দিকে তাকিয়ে। মুখে বল না অতসী ওমন খোঁচাচ্ছিস কেন? অতসী ফিসফিস করে বলে, বাড়ি চল। মেয়েদের ন্যাংটা ঠাকুর দেখতে নেই। মা বলেছে। ইন্দুবালা বলে তোর মা বলেছে যখন তুই যা না। আমি এখন চোখ আঁকা দেখবো। তারপর দুগগার শাড়ি পড়াও। অতসী মুখ

ব্যাঁকায়। এইজন্যে সবাই তোকে ঢুলুনি বলে। ব্যাটাছেলেদের গায়ে পড়া। ওই দ্যাখ কে এসেছে। ডাকছে তোকে। ইন্দুবালা ফিরে তাকায়। দূরে অন্ধকারে বড়

জাম গাছটার নীচে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে মনিরুল। যদিও মনিরুল তাকে ডাকছে না একটুও। অনেক দূর থেকে দাঁড়িয়ে সে দেখছে ঠাকুরের রঙ করা। ওই টানা টানা চোখ দুটোতে লাল কালির কাজল পরানো। কিন্তু ইন্দুবালার রাগটা যেন চড়াং করে মাথায় ওঠে। চন্ডীমন্ডপ থেকে সোজা নেমে এসে দাঁড়ায় মনিরুলের সামনে। এখানে কী করছিস তুই? মনিরুল আমতা আমতা করে বলে ঠাকুরের রঙ করা দেখছিলাম। ইন্দুবালা আরও রেগে যায়। তোর আবার ঠাকুরের রঙ করা দেখার কি আছে? আমি যা করবো তোকেও তাই করতে হবে মনিরুল? রাগলে তার নাকটা ফুলে ফুলে ওঠে। মনিরুলের সেটা দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু এখন একটুও তাকাতে পারছে না সে ইন্দুবালার দিকে। সবে গোঁফ ওঠা ছেলেটা মাথা নীচু করেই বলছে তোর খারাপ লাগবে জানলে আসতাম না। ইন্দুবালা আরও ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে আসবি না। চলে যাচ্ছে মনিরুল আস্তে আস্তে সাইকেল নিয়ে হেঁটে হেঁটে। ইন্দুবালাও ফিরে যাচ্ছে চন্ডীমন্ডপে। দুগগার চোখ আঁকা হচ্ছে। কুমুদ পাল তার শিল্পীর হাতের ছোঁওয়ায় দেবীর প্রান প্রতিষ্ঠা করছেন। কপোতাক্ষের মাটির ঠাকুরও যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু এইসব আর ভালো লাগছে না ইন্দুবালার দেখতে। বাড়ি চলে যাচ্ছে ইন্দুবালা। কেন অমন করে বলতে গেল মনিরুলকে সে? কি ক্ষতি হতো সে দুগগার চোখ আঁকা দেখলে? সবাই তো দেখছিল। ওই অতসীটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। ইন্দুবালাকে বলে কিনা ছেলে ঢলানি? যত রাগটা সে তাপসীর দিকে নিয়ে যেতে চায় তত রাগ গড়িয়ে আসে নিজের দিকে। ঠিক করলো কি ইন্দুবালা? মনিরুলকে কেন অমন করে বললো সে? আর কেনই বা মনিরুলের কথাই বারবার মনে পড়ছে? ভালোবেসে ফেললো নাকি ছেলেটাকে? অন্ধকারে পুকুর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় নিজেই যেন নিজের মুখ চাপা দেয়

ইন্দুবালা। কি বলছে সে? এক মুসলমান ছেলের সাথে এক হিন্দু মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। কোনদিন না। ঝোপ থেকে কোন একটা তক্ষক যেন ঠিক ঠিক বলে উঠলো। ভয় পেয়ে গেলো ইন্দুবালা আরও।

ছুট্টে বাড়ি এসে তার মনটা অবশ্য ভালো হয়ে গেল। ঠাম্মা উঠোন জুড়ে বসে নারকেল কুড়ছে। আর একদিকে দুধ জাল দিচ্ছে কাঠের উনুনে। কি করবে ঠাম্মা? ঠাম্মা হাসে। দেখিস না কি করবো। ইন্দুবালা নাছোড়। না আমাকে বলতেই হবে কি করছো তুমি। ঠাম্মা বলে ওই বারকোষটা তোলতো ইন্দু। এগিয়ে যায় ইন্দুবালা। বারকোষ তোলে। তার নীচে সাজানো ছোট ছোট ছাঁচ। কোনটা ময়ূর। কোনটা পান পাতা। কোনটা আলপনার নক্সা। ইন্দুবালার মুখটা যেন এই অন্ধকারে আরও আলো হয়ে যায়। তুমি চন্দ্রপুলি গড়বে ঠাম্মা? সরাসরি কোন উত্তর দেয় না ইন্দুবালার ঠাম্মা। মা দুগগাকে দেখেছিস তো দিদিভাই? কেমন এক চালার নীচে স্বামী সন্তানদের নিয়ে শান্তিতে আছে। ওই শান্তিটাই বড় জিনিস। ওটা না থাকলে জীবনে কিছুই থাকবে না। ইন্দুবালা নড়ে চড়ে বসে। অশান্তির কি হলো ঠাম্মা? আমি কি কিছু করেছি? ঠাম্মা নারকেল বাটতে বাটতে বলে না তুই কেন করবি দিদিভাই। মানুষ করে। মানুষ মানুষের নামে বদনাম রটায়। এতো রাতে সমত্ত মেয়ে বাইরে থাকলে বাড়ির অমঙ্গল হয়। ইন্দুবালার চোখ ফেটে জল আসে। আমি কিছু করেনি ঠাম্মা। মনিরুলকে চলে যেতে বলেছিলাম। মেয়ের সরলতা দেখে ঠাম্মা কি করবে বুঝতে পারে না। বাড়ির ভেতরে যাতে আওয়াজ না যায় তাই তক্ষুনি ইন্দুবালার হাতে ধরিয়ে দেন হাতাখানা। দুধটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে উঠছে দিদিভাই। যতক্ষণ না ক্ষীর হচ্ছে নাড়তে হবে। তলায় লেগে গেলেই মুশকিল। ধরা দুধের গন্ধ হলে চন্দ্রপুলি কেউ খাবে না যে।

নারকেল কোরা হয়ে গেছে ইন্দুবালার। এই বয়সে দশটা নারকেল কোরা চাড্ডিখানি কথা নয়। ঘামছেন তিনি। এবার বাটতে হবে শিলে ফেলে পুরোটা। মিহি করে। যাতে একটু এবড়ো খেবড়ো কুচি না পড়ে মুখে। জিভে দেওয়ার সাথে সাথে যাতে গলে যায় চন্দ্রপুলি। দিনের বেলা হলে ধনঞ্জয় জোর করে মিক্সিতে বাটতে বলতো। কিন্তু ইন্দুবালা জানেন প্রাচীন এক শিলায় নারকেল বাটা আর যন্ত্রে বাটার মধ্যে অনেক তফাত থাকে। পাথরের ওই স্বাদটা কি তিনটে স্টেনলেস স্টিলের ব্লেড দিতে পারে? কখনোই না। ইন্দুবালা তাঁর শ্বশুর বাড়ির সেই কবেকার ভারী শিল খানা পাতেন। বাটতে বসেন। আর ওই দিকে

তখন কবেকার যুগ এফাল ওফাল করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে বড় ছেলে, মেজো ছেলে তার কোলে আবার ছোট্ট মেয়েটা। আমরাও খাবো মা। ইন্দুবালা বলেন আগে হোক। তারপর খেও। এখন ঘুমিয়ে পড় যাও। কিন্তু কেউ যেতে চায় না। তিনজনেই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে ইন্দুবালার দিকে। ইন্দুবালা বুঝতে পারে এরা এখান থেকে কেউ নড়বে না। মায়ের জেদ আর ধৈর্য্য দুটোই তারা পেয়েছে। বড় ছেলেকে উনুনে দুধটা নাড়তে দিয়ে ছোট ছেলেকে এলাচ ছাড়াতে বলেন। মেয়েটা কোলে ঢুললেও বারবার জেগে উঠছে। মেজোর দিকে তাকিয়ে দাদ-দা বলছে। ও বাবা বলতে শেখেনি। কারণ বাবাকে ওর মনেই নেই। এই বাড়িতে বাবা বলে কেউ কাউকে ডাকে না। তাই ওই শব্দটা আপাতত ওর জীবন থেকে উধাও। দুধ উথলে ওঠার হলে বড় ছেলে ফু দেয়। ইন্দুবালা বকেন। ওইভাবে মুখের হাওয়া দিতে আছে? ঠাকুর খাবে না? মেজো এলাচ ছাড়াতে ছাড়াতে বলে তাহলে আমরা কখন খাবো মা? মেয়েটা কোল থেকে মা মা বলে ওঠে। ইন্দুবালা নারকেল বেটে চলেন। রাত বাড়তে থাকে। ঘন দুধ ক্ষীর হলে তার মধ্যে ওই নারকেল বাটা চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকেন। যতক্ষণ না মন্ডটা শক্ত হয়। ছেলে দুটো ততক্ষণ বসে থাকে। রান্নাঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঢোলে। মেয়েটা ঘুমের মধ্যে কাদা। ছোট ছোট ছাঁচে পুর গুলো পোরেন ইন্দুবালা। বড় কাঁসার থালায় ভর্তি হতে থাকে ময়ূর, নক্সাকাটা নৌকা, পাঁপড়ি মেলা ফুল, জলের মধ্যে হাঁস, পদ্মপাতার আলপনা আরও কত কতকি। ঘুম থেকে তুলে দেখান দুই ছেলেকে। মেয়েটার তো তখন অতো বোঝার বয়েস হয়নি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ছেলে দুটো। অবাক হয়ে। আর ইন্দুবালার ঠিক সেই মুহূর্তে কান্না পায়। ভীষণ কান্না পায়। ফাঁকা রান্না ঘরে থালা ভরা চন্দ্রপুলি নিয়ে সত্তর পেরোনো ইন্দুবালা মুখে কাপড় গুঁজে হাহাকার করেন। পাছে ধনঞ্জয় শুনতে পায়। ছেলেদের ফোন করে ডাকে। ওরা জেনে যায় ওদের মা ওদের সত্যি কত ভালোবাসে। ইন্দুবালা জানতে দিতে চান না তাঁর এই ভালোবাসা কাউকে। যাঁদেরই ভালোবাসতে গেছেন তারাই চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে। এটা যে অভিশাপ তাঁর জীবনে। উনি এই বয়সে সন্তান শোক পেতে চান না।

ঠাম্মা তাকিয়ে থাকে ফর্সা হয়ে আসা আকাশের দিকে। কাঠের উনুন প্রায় নিভে গেছে। উঠোন খানা ভর্তি হয়ে আছে হাতে গড়া ঠাম্মার চন্দ্রপুলিতে। মেয়ে মানুষের এতো কান্না কিসের? বুকে পাথর না বসাতে পারলে মেয়ে মানুষ হয়েছিস কি জন্য তুই? যা সাজি ভরে শিউলি ফুল তুলে নিয়ে আয়তো দিদিভাই। আর হাতে কয়েকটা চন্দ্রপুলি নিয়ে যা। যাকে ভালো লাগবে তাকে দিস। জীবনে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে নেই রে। ইন্দুবালা শাড়ির আঁচলে বাঁধে চন্দ্রপুলি। সাজি নিয়ে সারা রাত না ঘুমোনো চোখে কন্যে চলে ফুল তুলতে। কিন্তু কোনদিকে যাচ্ছে সে? এতো ভটচাজ পাড়া নয়। বিশালক্ষ্মী তলা পেরিয়ে সে যাচ্ছে মোক্তার পাড়ায়। কেন যাচ্ছে সে? অনেক ভোরে মোক্তার পাড়ার মাঠে শিউলি গাছটার নীচে কে যেন শাদা চাদর মেলে বসে থাকে। সেই চাদরের টুকরো গুলো কুড়িয়ে সাজিতে ভরতে ভালো লাগে ইন্দুবালার। শরতের এই ভোরেও কেমন যেন হেমন্তের হাওয়া দিচ্ছে। শিরশির করছে গা। চারিদিকে ছেড়া ছেড়া মেঘের মতো কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে। থমকে দাঁড়ায় ইন্দুবালা গাছটার সামনে এসে। কে ওখানে দাঁড়িয়ে? কে? এগিয়ে আসে মনিরুল। এতো ভোরে এখানে কী করছিস? কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছিল মনিরুল। যদিও সে জানতো এই গাছের ফুল কুড়োতে আসবেই ইন্দুবালা। তাকে আসতেই হবে। সারা রাত সে তো ঘোরের মধ্যে এঁকেছে ইন্দুবালার চোখ। কাজল দিয়ে। টানা টানা। ইন্দুবালা ডাকে মনিরুল। দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটা। এগিয়ে আসে ইন্দুবালা। মনিরুল বিড়বিড় করে বলে আমি কিন্তু জানতাম না তুমি এখানে আসবে...। আমি তো...। ইন্দুবালা হাত চাপা দেয় মনিরুলের ঠোঁটের ওপর। আমাদের ঠাকুর ঘরে নবদ্বীপ থাকা আনা অনেক পুরনো একটা কেষ্ট ঠাকুর আছে। ঠাম্মার শাশুড়ি তার শাশুড়ির ঠাকুর সেটা। তুই তার মতো চোখ কেন পেলি রে মনিরুল? সারাক্ষণ আমার চোখে ভাসে? শাড়ির খুট খুলে মনিরুলের হাতে ইন্দুবালা ধরিয়ে দেয় সারা রাত তার আর ঠাম্মার মিলে করা চন্দ্রপুলি। ঠাম্মা বলেছিল যাকে ভালো লাগবে তাকে দিস। আর একটা কথা না বলে একটাও ফুল না কুড়িয়েই খালি সাজি নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল মেয়ে। গায়ে তখন তার ধুম জ্বর।

সকালে উঠে ধনঞ্জয় দেখে কাচের বয়ামে ভর্তি করে রাখা আছে চন্দ্রপুলি। ইন্দুবালা তখন কুচো গজা ভাজছেন। ঠিক করে রেখেছেন ওবেলায় লবঙ্গ লতিকা করবেন। ধনঞ্জয় বুঝতে পারে না এটা কি ইন্দুবালার পাগলামো না জেদ? সারা রাত রান্না করে তুমি তো মরবেই। তোমার ছেলেরা আমাকে জেলে দেবে। ইন্দুবালা এগিয়ে আসেন। আহা ধনা তুই ওইভাবে বলিস না। ছেলে মেয়ে গুলো বিজয়ার পরে এসে একটু মিষ্টি মুখ করবে না? ওই যে চাঁদা তুলতে এসেছিল নণ্টু পিন্টু। বাজারের লোকগুলো। কালেক্টার অফিসের বাবুরা। এদের একটু দেবো না হাতে তুলে? হোটেল যবে থেকে শুরু হয়েছিল সেই বছর পুজো থেকেই বিজয়ার মিষ্টি শুরু করেছিলেন ইন্দুবালা। সেই সময়ে লছমী থাকতো। হাতে হাতে করে দিত মাঝে মাঝে। তারপর ছেলে মেয়েরা। একটু বড় হলে তারা ঠাকুর দেখার নাম করে কেটে পড়তো যে যার মতো। শুধু ইন্দুবালা থেকে যেতেন। তাঁর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী কেটে যেত রান্নাঘরে। বিজয়ার মিষ্টি তৈরীতে। তাঁর না ছিল নতুন কাপড় পরা। না ছিল প্যাণ্ডেলে গিয়ে অঞ্জলী দেওয়া। সেসব তিনি বিয়ের আগে কলাপোতায় কপোতাক্ষ নদীতে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন।

বৃষ্টি নামে ঝমঝম করে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের সামনে এক এক করে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। বড় ছেলে আসে। মেজো ছেলে। তাদের বউরা। নাতি-নাতনী সবাই। প্রনাম করে। মায়ের হাতে তৈরী চন্দ্রপুলি, কুচোগজা, লবঙ্গ লতিকা, নিমকি সবাই পেট পুরে খায়। ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে যায়। ওরা সবাই গল্প করে। ইন্দুবালা চুপ করে বসে শোনেন। কোথায় কোন ঠাকুর কত বড় হলো। কে প্রাইজ পেলো। তাঁতের সবচেয়ে দামী শাড়িটা পড়তে গিয়ে বড় বউয়ের কী হলো? নাতি নাতনিরা কিভাবে পুজো কাটালো। কোথায় কত লোক হলো। অঞ্জলী দিতে গিয়ে পুরোহিত কেমন বাজে করে মন্ত্র পড়ছিল। কোন রেস্টুরেন্টের পুজোর খাবার জঘন্য ছিল। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করে। ওদের সবার মধ্যে বসে থেকেও ইন্দুবালার কিছু বলার থাকে না। এই এতো সবার মধ্যে তিনি যেন নিজে একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপে তিনি ছাড়া আর কারও প্রবেশ যেন নিষেধ। ছেলেরাও একবারের জন্যেও জানতে চায় না

তাদের মা কোথাও গিয়েছিল কিনা। অঞ্জলী দিয়েছে কিনা। তারা জানে তাদের মায়ের ধর্ম কর্ম সব ওই একটিই। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। ঠাকুরের আপ্ত বাক্য। জীবে প্রেম। আর খাওয়া ছাড়া প্রেম আসবে কী করে? অনেক রাতে শুতে এসে প্রতি বছরের মতো এই বছরেও ইন্দুবালা তার হিসেবের খাতা টেনে নেন। একটা সাদা পাতায় লাল কালীতে লেখেন 'শুভ বিজয়া'।

সেটা যে কাকে লেখেন, কেন লেখেন আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

আট

কচু বাটা

বেলার দিকে একটু ঝিমুনি ধরে ইন্দুবালার। ইদানিং ভাত খেয়ে উঠলে এমনটা হয়। কলকাতার বাতাসে শিরশিরানি খেললে শরীরটা একটু রোদ চায়। কিন্তু সেই ফুরসত কি ইন্দুবালার আছে? তাঁর হোটেলে আসা মানুষগুলো তো সবে ভাত খেয়ে যে যার কাজে গেছে। দুপুরের পড়ন্ত রোদে তার একটা হিসেব রাখার আছে। কজন খেলো। কজন এলো না। কারা আবার ওবেলা আসবে। কাদের বাড়িতে পাঠাতে হলো। কাদের শুধু ঘন্ট আর পোস্তোর বড়া অর্ডার হলো। কতটা বাঁচলো। কতটা না। এইসব বিস্তারিত লেখালেখির একটা খাতা ইন্দুবালার আছে। সেই একাত্তর সন থেকে। এটা যদি হিসেবের খাতা হতো তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এখানে টাকার অঙ্কে কিছু মেলানো থাকে না। যা থাকে তাতে আরও নানান কিছু যোগ হয়। এতো পুরনো এক জাব্দা খাতা এতোদিনে শেষ হয়ে যাবারই কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। তার কারণ বছর বছর ইন্দুবালা সেই খাতার সঙ্গে আবার পাতা জোড়েন। মোড়ের মাথায় গণেশ বাইন্ডিং থেকে হারান আসতো। পয়লা বৈশাখের আগের দিন সেই খাতায় বড় সূচ ঢুকিয়ে ফুটো করে জোড়া হতো পাতা। সেলাই করে আবার খাতার গায়ে জামা করে দিতেন ইন্দুবালা। সেই নতুন জামা আবার পরের বছরে পালটে যেত। গেলবার হারান চোখ বোঁজার পর তার ছেলে শিব আসে। ইন্দুবালা নিজে সেই খাতা নাড়া চাড়া করতে পারেন না এখন আর। ওপরের ঘরে টেবিলের ওপরে রাখা থাকে। প্রতিদিন সেই খাতায় ইন্দুবালা নানা কিছু লিখে রাখেন। ফুল তোলা নক্সা। আরও কত হিজিবিজি।

ধনঞ্জয় বলে ওটা নাকি চিত্রগুপ্তের খাতা। বুড়ি পরপারে গিয়েও হিসেব মেলাবে। কিন্তু কি হিসেব, সেটা ধনঞ্জয় জানে না। বড় নাতনি সুনয়নী একবার

দেখেছে সেই খাতায় আছে নানা রান্নার কথা। কিছু কিছু ইন্দুবালার কথাও। সেই যে গেলবার সে বিদেশ থেকে এসে তার ঠাম্মার কাছে থাকলো বেশ কয়েকমাস তখন এটা সেটা নেড়ে চেড়ে দেখেছে মেয়ে। ইন্দুবালার একটুও পছন্দ হয়নি ব্যাপারটা। যা ভয় করেছিলেন সেটাই হয়েছে। বারবার নাতনি তাগাদা দিচ্ছে তাকে ওই খাতা খানা নাকি দিতে হবে, সে নাকি কিসব রান্নার কথা লিখবে। ইন্দুবালা সে কথা কানে তোলেননি। তাঁর হোটেলে যে কটা জিনিস সেই পুরনো আমল থেকে রয়ে গেছে এইখাতা খানাও তার মধ্যেই পড়ে। ওর পাতায় তো জিরান দেওয়া আছে মনিরুলের বকুল ফুল। লছমীর বাড়ির তেজপাতা। তিন ছেলে মেয়ের হাত ছাপ। অলোকের ফেলে যাওয়া নিষিদ্ধ ইস্তেহারের একটা পাতা। চেয়ারম্যানের চিঠি। আরও যে কতকি তা না দেখলে কল্পনাও করা যাবে না। অলোক খুব সুন্দর শিস দিয়ে একটা গান করতো। 'কিসের ভয় সাহসী মন লাল ফৌজে/ লাফিয়ে হলো পার'। গানটাও লেখা আছে সেখানে। চোখ বন্ধ করেন ইন্দুবালা। সুরটা খোঁজার চেষ্টা করেন। পারেন না। কারেন্ট অফের সেই রাত গুলোকে হাতড়ান। কোথায় তারা?

ধনঞ্জয় ছাদ থেকে কাপড় তুলতে এলে বুড়িকে দেখে মায়া হয় তার। বারান্দায় মাদুর পেতে বসে বুড়ি ঝিমোচ্ছে। মাথা নেমে এসেছে পায়ের কাছে। একটা বালিশ নিয়ে রোদটায় শুলে কী হয়? সারা জীবন কারো কথা কোনদিন শুনলো না। দুপুরের পর কতবার সে বলেছে ওগো মা একটু এলিয়ে এসো দিকিনি গা খানা বিছানায়। বুড়ি কথা শোনেনি। এতো কাজ কাজ করে মাথা খায় বুড়ি যে কারো দম ফেলার সময় থাকে না। ঘর থেকে বালাপোষটা এনে বুড়ির গায়ে চাপা দেয় ধনঞ্জয়। মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। যার সব থাকতেও কেউ নেই। এইভাবে কেন এতো কষ্ট করে আছো মা? একবার মুখ ফুটে বললেই তোমার ছেলে মেয়েরা তোমায় মাথায় করে রাখবে। চাল ধুতে ধুতে ইন্দুবালা ধনঞ্জয়কে বলেছিলেন, ওরকমটা সবার মনে হয় রে ধনা। বোঝাকে বেশীক্ষণ মানুষ ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে রাখতে পারে না। মনে হয় কতকক্ষণে নামাবে সে মাটিতে। আমি কারো বোঝা হতে চাইনা রে। ধনঞ্জয় কি বুঝেছিল কে জানে, শুধু সেদিন আর আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করতে যায়নি।

বুড়ি নিজেই তার কাজ খুঁজে নিয়েছিল বিস্তর। যত খাটছিলেন ইন্দুবালা হোটেলকে নিয়ে তত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ছিল দিকে দিকে। এবেলার রান্না কোনদিন ওবেলা কাউকে খাওয়াননি তিনি। কোন খাবার নষ্ট হতে দেননি কোনদিন। বেঁচে যাওয়া খাবার কোথায় কোথায় যাবে তারও একটা নির্দিষ্ট ঠিকানাও তৈরী করে ফেলেছিলেন। সেইসব মানুষ গুলো আজও অনেক আশা নিয়ে বসে থাকে।

রান্নাঘরের উনুনটা এখনও আগের মতো নিজের হাতেই পরিষ্কার করেন। মাঝে মাঝে ধনঞ্জয় করে না এমনটা নয়। কিন্তু নিজে করলে সুখ পান ইন্দুবালা। যত্ন করে মাটির প্রলেপ বোলান উনুনের গায়ে। আজকের উনুন? কত জন্ম জন্মান্তর ধরে মল্লিক বাড়ির লোকজন এই উনুনে চাল ফুটিয়ে দুবেলা ভরপেট খেয়েছে। রান্না তো আর শুধু রান্না নয়। যেন অগ্নিকে উপাস্য। আঁচের একটু এদিক ওদিক হলে সব ভন্ডুল হবে। নড়ে চড়ে বসে বুড়ি। বালাপোষের গরমে আরাম পেয়েই হোক কিম্বা ঝিমিয়ে পড়া দুপুরে ঘুমন্ত আঁচের কথা ভাবতে ভাবতেই হোক ইন্দুবালার ঘুম কাটে। সামনে দেখেন হাঁ করে চুপটি করে বসে আছে ধনঞ্জয়। মুখের দিকে তাকিয়ে। ইন্দুবালা হাসেন। এখনও বেঁচে আছি রে ধনা। মরিনি। এই দ্যাখ শ্বাস প্রশ্বাস চলছে এখনও। বিকেলের শেষ আলো তখন জানলার ওপর ঘেষে চলে যাচ্ছে। ইন্দুবালা হুড়মুড় করে উঠতে যান। আমার না হয় ভিমরুতি ধরছে তাই বলে তোর কোন আক্কেল জ্ঞান থাকবে না ধনঞ্জয়? বেলা যে পড়ে এলো। কাজ কত বাঁকি তার কি খেয়াল আছে? ইন্দুবালা চাটাই গোটান। বালাপোষ ভাঁজ করেন। ধনঞ্জয় সুরসুর করে সরে পড়ে সেখান থেকে।

সত্যিই কাজের আর শেষ নেই। দুপুরে সব খদ্দের খেয়ে চলে গেলে আনাজ দেখে, মিলিয়ে কি কি আনতে হবে আর না হবে তার একটা ফর্দ করার থাকে। রাতের রান্না কি হবে তাও ভাবতে হয়। সেই মতো ধনঞ্জয়কে নানা কিছু বলার থাকে। কি কি ভেজাতে হবে। ছোলা, মটর, বাদাম, হিঙ, কিসমিস, কাজু। কি কুটনো কাটতে হবে। কোন রান্নাটা গ্যাসে হবে আর

কোনটা উনুনে। কয়লা আর গ্যাস ঠিক আছে কিনা। মানে যার যেমন দিনের বরাদ্দ সেটাই আছে কিনা। মাঝপথে ফুরিয়ে যাওয়াটা অলুক্ষুনে। কাজেই আগে ভাগে সব দেখে রাখা চাই। ইন্দুবালা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। এতোটুকু এদিক ওদিক হবার জো নেই।

যদি কোনদিন ইন্দুবালার সাথে সারাদিন ঘুর ঘুর করা যায়, তাঁর হেঁশেলে উঁকি দেওয়া যায় তাহলে একটা দিনলিপি লেখার ইচ্ছে করবে। এমন যে কেউ করেনি সেটাও বলা যায় না। অনেক কাগজেই ইন্দুবালার ভাতের হোটেলের কথা ছাপা হয়েছে। তার সাথে তার বড় বড় দুটো উনুন, গ্যাস, সেই প্রাচীন শিলনোড়া, মশলা রাখার বাক্স, পেল্লাই সাইজের ভাতের ডেকচি, হাঁড়ি, কড়াই, রান্নার ছবি, খাবারের ছবিও ছাপা হয়েছে। শুধু যদি এটা হতো তাহলে তো কথাই ছিল না। এমনটা তো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়েছে। এই শহরে তার উদাহরণ আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। কিন্তু যেটা হয়নি সেটা হলো একদল মানুষ সে বুড়ো থেকে শুরু করে ছেলে মেয়ে বাচ্চাকাচ্চা সমেত এতো হুজুগ একটা ভাতের হোটেলকে নিয়ে খুবই কম হয়েছে। যারা অনেক দূরে থাকে বা অনেক কাছে, যারা কলেজে পড়ে, হোস্টেল বা মেসে থাকে, যারা অফিস করে, ব্যবসা করে মানে যারাই ইন্দুবালার সংস্পর্শে একবার এসেছে তারা আবার ইন্দুবালাকে যেন দুচোখে হারায়। ফলে এই যুগে চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলা ছেলে মেয়েগুলো ফেসবুকে ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের একটা কমিউনিটি পর্যন্ত খুলে ফেলেছে। সেখানে যেমন প্রতিদিনের মেনু আপডেট হয় ঠিক তেমনই রান্নার ছবি থাকে। তার সাথে সেই রান্নার গল্প। এমনকি সেই দিন ইন্দুবালার মেজাজ কতটা উনুনের আঁচের সাথে ওঠানামা করছে সেটাও। কত কত মানুষ যে এই পেজ লাইক করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইন্দুবালার কাছে তাদের ভাত খাওয়ার কথা লিখেছে। গল্প লিখেছে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে স্বজন পরিজন ছেড়ে চলে আসা এক অচেনা অজানা শহরে শুধুমাত্র একটা ভাতের হোটেল কিভাবে তাদের বাড়ির কথা, মায়ের কথা, ঠাম্মার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে সেই নিয়ে ভুরি ভুরি লেখা আছে। কমেন্ট আছে। জাঁকিয়ে চলছে গ্রুপটা।

ইন্দুবালা এতো কিছু জানেন না। তাঁর ইচ্ছেও করে না এইসব নিয়ে মাতামাতি করতে। হোটেলে অনেক কাজের মধ্যে তিনি অন্য কিছু যেন ভাবতেও পারেন না। তবুও কি ভাবতে হয় না তাঁকে? হয়। এই ফেসবুকের পেজ হওয়ার পর থেকে নানা রকমের বিপদ নানা দিক থেকে আসতে থাকে। এই যেমন সেদিনকে সবে রোদে পা ছড়িয়ে একটু ঝিমোতে বসেছেন অমনি সামনের মেসের নতুন মেয়েটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। চশমার ভেতর থেকে গোল গোল চোখ করে বললো তুমি কচু বাটা কেন আর করো না ঠাম্মা? ইন্দুবালা ঝিমোচ্ছিলেন। ঘোর লাগা চোখে বোঝার চেষ্টা করেন কি বলছে মেয়েটা। কোথায় থাকো? খাওয়া হয়েছে? ক্ষিদের পেটে কচু খাবে কেন? ধনাকে বলো ভাত গরম করে দেবে। আর অবেলায় ভাত খেতে ইচ্ছে না করলে রুটি করে দেবে। চাও যদি বেগুন পোড়াও খেতে পারো। অল্প করে কুলের তেল দিয়ে মেখেছি। গন্ধ হয়েছে বেশ। মেয়েটা আরও চোখ গোল গোল করে বলে ধুর তুমি কি সব ভুলে যাও নাকি ঠাম্মা? এই তো খেয়ে গেলাম। রুটি না খেলেও বেগুন পোড়া ছাড়বো তুমি ভাবলে কী করে? খেয়েছি। কি করে যেসব অদ্ভুত জিনিস মাথা থেকে বার করো বেগুন পোড়ায় কুলের তেল। জাস্ট ফাটাফাটি। ইন্দুবালা হাসেন।

বড় বড় বয়ামে কুল জিরানো থাকতো তেল দিয়ে। ঠাম্মার যে কত রকমের আচারের আহ্লাদ ছিল। প্রত্যেক ঋতুতে আলাদা আলাদা ফল। তাদের আচার। তার সাথে তেল। সেই তেল আবার রান্নার সাথে মেশানো। সে অনেক ঝক্কি ঝামেলার কাজ। আমি ওতো পারি না। তা কোথায় থাকো তুমি? মেয়েটা হাত তুলে দেখায় ওই তো রাস্তার ওই দিকের মেসে থাকি। সঞ্চারী। খাতায় যে নাম লিখলাম। ইন্দুবালা এগোন রান্নাঘরের দিকে। বাহ সুন্দর নাম তো সঞ্চারী। কে রেখেছিল মা? সঞ্চারী বলে ধুর...মা রাখবে কোথা থেকে? সে তো জন্মের দিনই মারা গেছে। থমকে দাঁড়ান ইন্দুবালা চৌকাঠের কাছে। ঘুরে তাকান মা মরা মেয়েটার দিকে। সঞ্চারী এগিয়ে আসে। বাবা দিয়েছিল নাম। তা বাবাও এখন আর নেই। একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল। চলে গেছে। মামা-মামীর কাছে থাকি। মানে ওরা আমাকে দেখে। লোকাল গার্জেন। এমনিতে

আমার কেউ নেই জানো। কিন্তু অনেক অনেক বন্ধু আছে। এখন তো কলেজ। তাই মেসে থাকতে হয়। বকবক করে সরলতায় ভরা চোখ মেয়েটা। ইন্দুবালা কিছু বলেন না। এগিয়ে যান রান্নাঘরের দিকে আস্তে আস্তে। পেছনে থাকে সঞ্চারী।

প্রত্যেকদিন এই হোটেলে যারা খায় তাদের একটা মাসিক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নিজেরাই খাতায় নাম লেখে। নিজেরাই হিসেব রাখে। ওই দেনা পাওনার হিসেব ইন্দুবালাকে কোনদিন মেলাতে হয়নি। তাঁর পয়সা মেরে দিয়ে পালানোর লোকের সংখ্যা হাতে গোনাও যাবে না। ইন্দুবালা মনেও রাখেন না। দু মুঠো ভাত খেয়ে যার ইচ্ছে হয় পয়সা দেবে। যার ইচ্ছে না হয় দেবে না। ঠাম্মার কথা গুলো আজও তার কানে বাজে। মহাভারতের সেই কবেকার পুরনো বইটা খুলে গড়গড় করে পড়ে চলতো। বনপর্বে যুধিষ্ঠির কি বলছে জানিস? শোন ইন্দু। সব তো আমাদের ঘরের কথাই লিখে গেছে। মানুষের ধর্ম কী? মানুষের ধর্ম হল মোদ্দা কথায় অপর মানুষেরভ সেবা করা। সেই সেবা কেমন? যেমন ধর যুধিষ্ঠির শুধু বলছেন না। মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "সাধুগণের গৃহে তৃণ, ভূমি, জল, ও সুণৃতবাক্য এই চারি দ্রব্যের কোন কালেই কোন অপ্রতুল থাকে না। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি নয়ন, মন ও প্রিয় বচন প্রয়োগ এবং উত্থান পূর্বক আসন প্রদান করিবে। ইহাই সনাতন ধর্ম।" মানুষকে সেবা করে আরাম পাওয়া যায়। মনের আরাম। ইন্দুবালা কি সেই জীবে প্রেম করছেন না? কোথায় করছেন? এটা কি জীবে প্রেম। প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজেন ইন্দুবালা। আর ঠিক তখনই ঘোর কাটে, কি গো ঠাম্মা কচুবাটা করবে কিনা বলো। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটা নাছোড়। ইন্দুবালা রাতের আনাজ মিলিয়ে দেখছিলেন। রোদটা আস্তে আস্তে পশ্চিমে ঘুরছে। এবার ছাদের আলসের মাথায় চড়ে এক্কেবারে হারিয়ে যাবে। আর দেখা যাবে না। ওইদিকের বড় ঝুড়িখানায় দেখতো গোটা বিশেক আলু আছে কিনা? সঞ্চারী গোনে ঠিক বাচ্চাদের মতো করে। ইন্দুবালা মশলার বাক্স হাঁটকান। দেখে নেন সব ঠিক করে। সঞ্চারী এগিয়ে আসে। বিশটারও বেশী

আলু আছে। ইন্দুবালা বিড়বিড় করেন। তাহলে আনাতে হবে আরও। সর দেখি ধনাকে বলি। সপ্তারী হাত ধরে নেয় ইন্দুবালার। বললে না তো কচুবাটা করো না কেন এখন? ইন্দুবালা বঁটিখানা নিয়ে এসে আলুর খোসা ছাড়াতে বসেন। ওইসব আমি করেছি নাকি কোনদিন? তোর পড়াশুনো নেই? যা গিয়ে পড়তে বোস। আমাকে কাজ করতে দে। সেই মেয়েও ছাড়বার নয়। কচু বাটা করোনি মানে? এই দেখো ফেসবুকে একজন লিখেছে নারকেল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তোমার হাতের কচু বাটা যে খায়নি সেতো ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের কিছুই জানে না। এবার একটু বিরক্ত হন ইন্দুবালা। এইসব আবার কে লিখেছে? তোরাই বা এইসব লিখতে বলিস কেন? মেয়েটা অবাক হয়। আমরা লিখতে বলেছি নাকি? এই যে দেখো অমলেন্দু বাবু কৃষ্ণনগরে থাকেন। কলেজে ফিজিক্স পড়ান। তিনি লিখেছেন। এখানে থেকে পড়ার সময় এইট্টিজে রোজ ভাত খেতে আসতেন তোমার হোটেলে। চিনতে পারছো? ইন্দুবালা মেয়েটার ফোনের মধ্যে থেকে একটা অস্পষ্ট মুখ দেখেন। এতো কিছু কি মনে থাকে দিদিভাই? কত লোকতো আসে। কত লোক চলে যায়। মেয়েটা শুনবে না। ওসব জানি না কিছু। কচু বাটা খাওয়াতে হবেই হবে। আমি আজই লিখে দিচ্ছি ফেসবুক পেজে তুমি আবার কচু বাটা খাওয়াচ্ছো আমাদের। বুঝলে?

ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের নোনাধরা সিমেন্টের কালো বোর্ডটা যে কবে থেকে ফেসবুকের বোর্ড হয়ে গেছে ইন্দুবালা সেটা জানেন না। জানার কথাও না। এখনকার ফোন ইন্দুবালা ব্যবহার করেন না। তাঁর আছে সেই কবেকার ল্যান্ড লাইন। সরকারের ফোনের ব্যবসা লাটে উঠলেও ইন্দুবালা সেই ফোনে আজও কাজ চালান। ছেলেরা, মেয়েরা ওই ফোনেই মায়ের খবর নেয়। ইন্দুবালা দুটো কথা বলে শান্তি পান। তবে এই এখনকার ছেলে মেয়েদের ফোন ব্যবহার না করলেও তিনি বুঝতে পারেন এর মাহাত্ম্য কি। ওখানে কিছু লেখা হয়ে গেলেই গোটা বিশ্বের লোক জানতে পারবে। আর ঠিক তখন থেকেই বাড়বে উৎপাত। সেই কবেকার পুরনো ল্যান্ড লাইন ফোনটা আবার বাজতে থাকবে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং। বাড়ির সামনে ভিড় হবে। দশ জনের বদলে একশোজন ভাত খেতে চলে আসবে। পাড়ার লোক বিরক্ত হবে গাড়ি

রাখার জায়গা পাবে না বলে। ধনঞ্জয় বড় খোকা, ছোট খোকা, খুকি সবাইকে ফোন করবে। নালিশ জানাবে। আর কেউ না আসুক বড় খোকা এসে বসে থাকবে ঠায়। নজর রাখবে। তাকে নজরে রাখার জন্য তার বাড়ি থেকে বউ ফোন করবে। ছেলে ফোন করবে। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এইসব ভেবেই শীত আসা সন্ধ্যেয় ইন্দুবালা ঘামতে শুরু করেন। আগে এমন হতো না। কেউ খেতে চাইলেই ইন্দুবালার আনন্দ হতো। এখনও হয়। কিন্তু এতো বড় হয়ে যায় ব্যাপারটা সব কিছু ইন্দুবালা যেন সামলাতে পারেন না। তবুও বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না বুড়ির। এখনও সাধারণ দিনে ভাতের হোটেলে পাত পড়ে কম করে তিনশো মানুষের। বুড়ি এই বয়সে উনুনের সামনে এসে যখন কড়াই পেতে দাঁড়ান সাক্ষাত অন্নপূর্ণা মেনে গড় করে অনেকে।

কী হলো? কিছু বলছো না যে? সঞ্চারী তাকিয়ে থাকে ইন্দুবালার দিকে। ইন্দুবালার মুখে হাসি ফোটে। কোথা থেকে আমার ঠাম্মার মতো অমন চোখ পেয়েছিস বলতো? আর অমন পাড়া গেঁয়ে বিধবাদের মতো চুল কেটেছিস কেন? সঞ্চারী বলে ইশ। পাড়াগেঁয়ে বিধবাদের মতো লাগছে নাকি? কতটাকা দিয়ে চুল কেটেছি জানো? শুনলে মামা বাড়ি থেকে বার করে দেবে। কেন খারাপ লাগছে দেখতে? ইন্দুবালা হাসেন। মোটেই না। মিষ্টি লাগছে। মা্মা নাহয় চুল কাটার দাম জানতে পারলো না। কিন্তু এই যে দিন নেই রাত নেই মেসের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ফস ফস করে সবাই মিলে সিগারেট টানা হয় সেটার কথা জানে তো? মেয়েটা জিভ বার করে। তুমি কি সব খেয়াল রাখো ঠাম্মা? ইন্দুবালা হাসেন। একদিন সময় করে নিশ্চই কচু বাটা খাওয়াবো দিদিভাই। কিন্তু আজকে ওইসব তোমাদের কিসব পেজ-টেজে লিখোনা কিছু কেমন? মেয়েটা বলে কেন লিখলে কী হবে? ইন্দুবালা বোঝান। আগে ওই নরম কচুটাকে আমায় পেতে হবে তো। সেই শহর কি আছে? বললেই কেউ ছাই গাদায় হওয়া একটা কচু গাছ অমনি উপড়ে নিয়ে চলে আসবে? আর যে সে কচু হলে তো হবে না। সেই মানকচুর ভেতরে দুধে টইটম্বুর হতে হবে। গাছ দেখলে বুঝতে হবে গর্ভিনী সে। অনেক তরিজুত করে তাকে তুলতে হবে। রান্না করতে হবে। তবেই না অনেক দিন পর তুইও আমাকে মনে রাখবি? তখন

হয়তো কোন বিদেশ বিভুঁই থেকে আমার কথা লিখবি। এই ভর সন্ধ্যে নামার আগে এক অচেনা মেয়ের চোখ চিক চিক করে ওঠে। আমি কোথাও যাবো না ঠাম্মী। কোত্থাও না। আমি শুধু ওই মেসবাড়িটায় থাকবো আর তোমার রান্না খাবো। ছুট্টে চলে যায় সঞ্চারী। অমন ছলছল চোখ করে একদিন ইন্দুবালাও বলেছিল সে কোলাপোতা ছেড়ে কোত্থাও যাবে না। কোনদিন না। ঠাম্মাকে জড়িয়ে ধরেছিল সেদিন। ঠাম্মা বলেছিল মেয়েদের প্রান হল কই মাছের জান। কত কি যে করতে হবে আর দেখতে হবে জীবনে। এই ছোট্ট গ্রামটায় আমার মতো কেন পড়ে থাকবি বলতো? সবে শীত আসা সন্ধ্যেয় কবেকার ঠাম্মার মুখ মনে করায় এক অচেনা ছোট্ট মেয়ে। কার বেশ ধরে এসে তুমি আমার কাছে আজ খেতে চাইছো ঠাম্মা? আমি যে বড্ড বুড়ি হয়ে গেছি। তোমার ইন্দু যে আগের মতো আর নেই গো। চোখ থেকে জল পড়ে। ধনঞ্জয় ঘরে এলে বুড়ি চোখ মোছে। একটু পরে দেওয়া যেত না আঁচটা? ধোঁওয়ায় চোখ জ্বলে গেল যে ধনা।

লছমীও মাঝে মাঝে এমন ছলছল চোখে তাকাতো। কী হয়েছে জানতে চাইলে কিছুতেই বলতো না। স্বামীটা যে তার কোথায় পালিয়েছিল কেউ জানে না। অতোগুলো বাচ্চা নিয়ে লছমী সেই কতদূর থেকে মাছ নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করতো। ইন্দুবালা বুঝতো একজন একা থাকা মানুষই বুঝতে পারে আর একজনের এ্কার লড়াইয়ের মর্ম। ওরা যেন দুজনে দুজনের পরগাছা হয়ে জড়িয়ে থাকতো একে অপরকে। খুব টানাটানির সময়ও কিছুতেই লছমীকে টাকা পয়সা দেওয়া যেত না। ইন্দুবালার হোটেল শুরু হবার পর। লছমীর কোচড়ে বেঁধে দিত তার ছেলে মেয়েদের জন্য খাবার। লছমী নেবে না কিছুতেই। ইন্দুবালা বলতো এক মা তার সন্তানদের দিচ্ছে। তুই নিবি না তো? লছমী প্রতিদানে ফিরিয়ে দিয়ে যেত অনেক কিছু। মাছ ছাড়াও কচু, মেটে আলু যে গুলো চট করে বাজারে পাওয়া যেত না। কবে সে যেন একবার নিয়ে এলো কোথা থেকে জোগাড় করে চুইঝাল। ইন্দুবালার সেদিন যেন সারাদিন ঘোরের মধ্যে কাটলো। এক টুকরো খুলনাকে যেন লছমী বয়ে নিয়ে এলো আঁচলে করে। ইন্দুবালা কিছুটা রান্না করলেন চুইঝাল দিয়ে। একটু তুলে রাখলেন।

আর বাকিটা বসিয়ে দিলেন নারকেল গাছের কাছে। ভাবলেন একবার যদি চুইঝাল গাছটা বেঁচে যায় তাহলে তিনি সেটাকে নারকেল গাছে ওঠাবেন। আর সব রান্নায় চুইঝালের মিষ্টি গন্ধে ভরিয়ে দেবেন। কিন্তু সেটা আর হয়নি। বাঁচেনি গাছটা। সেও হয়তো বুঝেছিল উদ্বাস্তু হয়ে বাঁচার দায় অনেক।

একটা সময় ছিল যখন লছমী নানা রকমের খবর রাখতো। কার বাড়িতে কচু হয়েছে। কার বাড়িতে লাউ। কে জঙ্গল হয়ে গেছে বলে কুমড়ো শাক ফেলে দিতে চায়। সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আসতো লছমী। এই হোটেল মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পেছনে লছমীর অবদান কম নয়। ও না থাকলে আজ হোটেল তো হতোই না। এক মাছওয়ালী কেমন যেন ইন্দুবালার মনের কথা সব জেনে যেতো। টের পেত ইন্দুবালা কী ভাবছে। তুই কি ঝাড়ফুক তুকতাক জানিস লছমী? বারান্দায় পা ছড়িয়ে বেলা শেষে বাড়ি যাওয়ার আগে গল্প করতো। ওইসব জানলে সেই কোথা থেকে এসে মাছের টুকরি নিয়ে দোরে দোরে ফিরি মা? ইন্দুবালা ভাবেন তাও ঠিক। তাঁর গল্প লছমী জানে। কিন্তু লছমীর গল্প তাঁর তো জানা নেই। এমনকি লছমী কোথায় থাকে সেটাও জানেন না ইন্দুবালা। এই লছমী তোর বাড়ি কোথায় রে? লছমী হাসে। কেন তুই যাবি? ইন্দুবালা বল্‌েন হ্যাঁ যাবো। তুই আগে বল কোথায় থাকিস? লছমী বলে শোনো তাহলে। এখান থেকে ইস্টেশন। ইন্দুবালা বলেন মানে শিয়ালদা? লছমী ঘাড় নাড়ে। হাঁ গো। সেখান থেকে ক্যানিং লোকালে চড়ে একেবারে লাস্ট স্টেশনের আগে তিনটে স্টেশন। ওখান থেকে আবার রিক্সাভ্যান। চল যাবি আজকে? হাসে লছমী। ইন্দুবালা বল্‌েন আজ তো যাবো না। তোকেও যেতে দেবো না। এতোদূর থাকিস তুই? একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। তার ওপরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে যা লছমী। এই শীতের দিনে নাই বা এতোটা দূরের পথে বাড়ি গেলি? লছমী অবাক হয়ে বলে হাই রাম। কি বলছিস তুই মা? বাড়ি না গেলে মাছ আনবো কী করে? মাছ না আনলে খাবো কী? তুই হোটেল চালাবি কী করে? লছমী সেই শীতের বাদলে বেরিয়ে যায়।

অনেক সকালে এসে দরজা হাটকায় লছমী, মা...ওই মা...এখোনো তুই শোয়ে আছিস। ইন্দুবালা বেরিয়ে দেখেন মাছের সাথে একটা মস্ত মানকচু। তুই এটার কথাই বলেছিলিস না মা? ইন্দুবালা অবাক হয়ে যান। এটাকে কোথায় পেলি তুই? লছমী বলে যায় সে অনেক বড় গল্প আছে মা। বাজার ফেরতা পথে বলবো। লছমী চলে যায়। দুই ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে ইন্দুবালা কচু কাটতে বসেন। সেগুলোকে জলে ভেজান। কুরনি নিয়ে এসে টুকরো গুলো কুরতে বসেন। ধনঞ্জয় নেয়ে ধুয়ে এসে ভীষণ চোটপাট করতে শুরু করে। কোন সহজ রান্না তোমার হেঁশেলে নেই না? একে কচু। তার ওপর এই নারকেল। কি হবে শুনি? ইন্দুবালা গম্ভীর হয়ে বলেন কয়লার বস্তার মুখ ঢেকেছিলি কাল রাতে? সব তো জলে চিপসে হয়ে গেছে। রান্না হবে কী দিয়ে? লছমী কচু না আনলে লোকগুলো ফিরে যেত। অনাচ্ছিস্টি হতো। এখন কথা না বাড়িয়ে উনুন ধরাও গে। দেখো ঠাকুরের কৃপায় ভাতটা হয় কিনা। ধনঞ্জয় কথা বাড়ায় না। নিজে ভুল করেছে। কয়লার বস্তা ঢাকেনি। ভিজে গেছে সব। মাথা নীচু করে উনুন ধরাতে চলে যায় ধনঞ্জয়।

ইন্দুবালা কুরনিতে কচু আর নারকেল কোরে্ন। সেই কচু আর নারকেল সরষে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বড় শিলটায় বাটতে থাকেন। চারপাশটা ভরে উঠতে থাকে এক বুনো গন্ধে। অনেকদিন পর খুলনার কোলাপোতা যেন হাতছানি দেয় তাকে। ইন্দুবালাকে ডাকে বোসপুকুরের পাশে বাঁশ ঝাড় পেরিয়ে কচু বোন। শীতের অবেলার বৃষ্টি। মাথায় দুটো বড় কচুপাতা নিয়ে দুই ভাইবোন কচু তুলতে যায়। গা হাত পা চুলকোয়। মা বকে। ঠাম্মার কাঁদো কাঁদো মুখটা আজও কেমন যেন মনে পড়ে যায় ইন্দুবালার। জ্বরের পরে স্বাদহীন মুখে খেতে চেয়েছিলেন কচুবাটা। মাকে বলেননি। জানেন এই বাদলায় কিছুতেই তিনি ইন্দুবালাকে পাঠাবেন না। ইন্দুবালাকে ডেকে বলেছিলেন নিয়ে আসবি নাকি ইন্দু? বোসেদের বাগান থেকে একটা কচু তুলে? ইন্দু না বলতে পারেনি।

ভূতের ভয় ছিল তার। তাই ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু ইন্দু চিনবে কী করে ভালো মানকচু? সেসব তো অনেক দিন আগেই ঠাম্মা নিজে হাতে করে শিখিয়েছে। চারপাশ থেকে ছড়ার মতো পাতা যার বেরিয়েছে। ফুলের মতো হয়ে আছে গাছ। সে জানবি গর্ভবতী। মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছে সন্তানকে। তার মধ্যে টইটম্বুর দুধ। গোড়ায় ডেউ পিঁপড়ে গুলোকে দেখেছিস? লোভীর মতো কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে? ঠাম্মা বড় শাবল নিয়ে এসেছিলেন। ভিজে মাটিতে তাড়াতাড়ি বসে যাচ্ছিল শাবল। উঠে আসছিল ঘন কৃষ্ণকায় মাটি। গর্ত যত গভীর হচ্ছিল দেখা যাচ্ছিল শিকড়টাকে। যেখানে লুকিয়ে রেখেছে তার খাবার। একটু পরেই মাটি খুড়ে গর্ত করে কচু বের করা হল। গায়ে শক্তি ছিল বুড়ির। সেই কচু কেটে বেটে গাঁ সুদ্ধু লোক খেলো। আর আজ ঠাম্মার জ্বর। তাকে মা একটু কচু বেটে দিতে পারছে না? ভাইটা পাশে দাঁড়িয়ে খালি গা চুলকোচ্ছে। কচুর রস লেগে লাল হয়ে গেছে তার হাত পা। চুলকোতে চুলকোতে ফুলে গেছে হাতের ওপর দিকটা। তার সাথে মা গাঁ মাথায় করছে চিল চিৎকার করে। বুড়ির মরার সময় এলো নোলা গেল না। ইন্দুবালা চুপি চুপি রান্না ঘরে ঢোকে। পিঁড়ি পেতে বসে। কচু কেটে, কুরে, বাটতে বসে। কচুর ওপর ছড়িয়ে দেয় কাঁচা তেল। অনেক দিন পর দুপুর বেলা ধোঁওয়া ওঠা ভাতে কচু বাটা খেতে বসে ঠাম্মার চোখে জল। সেটা কাঁচা লঙ্কা সর্ষের তেলের? নাকি আনন্দের বুঝতে পারে না ইন্দুবালা। খাওয়া হয়ে গেলে এক পরিতৃপ্তির মুখ নিয়ে জড়িয়ে ধরেন ইন্দুবালাকে। তার হাত দুটো বুকের কাছে নিয়ে কিসব বিড়বিড় করে বলেন। আশীর্বাদ কর্‌েন। ঠাম্মা কি জানতো একদিন ইন্দুবালাকে এই হাত দুটোই বাঁচিয়ে দেবে? তারই কি ডাল সাঁতলানোর প্রস্তুতি সেরে রাখছিল ঠাম্মা?

বিকেলের দিকে চাদর গায়ে দিয়ে ইন্দুবালাকে বেরোতে দেখে পথ আটকায় ধনঞ্জয়। চললে কোথায় শুনি? ইন্দুবালা বলেন হেতালের মাকে একটু বলে আসি। যদি একটু কচি কচু পায়। ধনঞ্জর রেগে যায়। সেটা কাল সকালে বললেও হবে। এক্ষুনি সন্ধ্যে নামবে। রাতে ভালো দেখতে পাও না। আমি হোটেল ছেড়ে বেরোতে পারবো না। একা কী করে যাবে শুনি? ইন্দুবালা

ধনঞ্জয়ের নাক ফোলানো দেখে হাসেন। জানিস না আমার যে একজোড়া বেড়ালের চোখ আছে। রাতেও দেখতে পায় ভালো। ধনঞ্জয় বিরক্ত হয়। কচু বাটা করতেই হবে? যে যা বলবে তোমাকে তাই করতে হবে? না বলতে পারো না তুমি তাই না? ইন্দুবালা বলে ওমা সেকি কথা। মেয়েটা মুখ ফুটে একটু কচু বাটা খেতে চেয়েছে না বলবো কী করে? ধনঞ্জয় চিৎকার করে। তুমি কিন্তু বলেছিলে লছমী মারা যাওয়ার পরে এই বাড়িতে কচুবাটা হবে না। কেমন যেন ধাক্কা খান ইন্দুবালা। সন্ধ্যে নামছে সবে শীত আসা শহরে। ছেনু মিত্তর লেনে যে কটা পুরনো বাড়ি রয়ে গেছে। যেগুলো এখনও ফ্ল্যাট হয়ে যায়নি সেগুলোর জানলা বন্ধ। অনেক উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট গুলোতে বাইরে থেকে বোঝা যায় না সেখানে মানুষ থাকে কিনা। কিম্বা প্রানের কোন অস্তিত্ত্ব আছে কিনা। মাঝে মাঝে কাপড় জামা জানলা কিম্বা বারান্দায় ঝুললে বোঝা যায় ওখানে কেউ বাস করে। ইন্দুবালার এই মুহূর্তে নিজেকে বড় একা মনে হয়। কবেকার লছমীর কথা মনে পড়ে যায়। সারাক্ষণ চারপাশে যাদের সাথে কথা বলেন তাদের মধ্যে যে লছমী নেই সেটাই ভাবতে পারেন না তিনি। চান না। কেন তিনি এতোদিন বেঁচে আছেন এই ভাবনা মাথায় চাগাড় দেবার আগেই হনহন করে হাঁটতে থাকেন ইন্দুবালা হেতালের মায়ের ঝুপড়ি ঘরের দিকে।

বাজার থেকে ফেরার পথে লছমী বলে কই মা দাও দেখি ভাত খাই তোমার কচু বাটা দিয়ে। শীতের বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গেছে লছমী। ইন্দুবালা আলমারী থেকে নিজের একটা কাপড় বের করে দেন। লছমীর বারণ করা সত্ত্বেও গরম জল করে দেন স্নানের জন্য। আসন পেতে। গরম ভাত বেড়ে খেতে দেন লছমীকে। কচুবাটা দিয়ে ভাত মেখে লছমী মুখে তোলে। এটা কি করেছিস মা? অবাক হয়ে তাকায় ইন্দুবালার দিকে। ভালো লাগেনি তোর? ভয়ে ভয়ে জানতে চান ইন্দুবালা। লছমী বলে ভালো মানে বহুত ভালো। শুধু কচুবাটা দিয়ে সব ভাতটা খেয়ে নেয় লছমী। কত দিন পরে তাকে এইভাবে বসে কেউ খাওয়ালো। কতদিন পর? বয়েস যখন বারো কি চোদ্দ শাদি হয়ে গিয়েছিল তার। ইন্দুবালা অবাক হন এতো ছোট বেলায়? লছমী বলে তা নয়তো কি? বাপ তো মেয়েকে বিদাই দিতে পারলে বাঁচে। গ্রামে তো আর

আমার বয়সী একটা মেয়েও ছিল না। তারপর বাবা চারটে ভইষ সওদা করে টাকা দেয় আমার মরদকে। তখন রাজী হয় সে। তোমার কত সওদা হয়েছিল মা? ইন্দুবালা হাসেন। সবটা তো আর বাবা বলেনি। তবে গা ভর্তি গয়না পড়িয়ে দিয়েছিল মা। সেই গয়নার আজ একটাও নেই। বাবু মাষ্টার রতনলাল মল্লিকের হাত দিয়েই সব খরচ হয়ে গেছে অনেক দিন আগে। লছমীরও কোন গয়না নেই। মন খারাপ করে বসে থাকে দুজনে। গয়নার জন্য কি শুধু? মোটেই না। কবে তুই শেষ তোর গ্রামে গেছিস লছমী? লছমী বলে তাও বছর দশ আগে। বাবা মা কলেরায় মারা গেল। তারপর কমলা নদীতে বান এলো। সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। সব কুছ। আমাদের গাঁওটা আছে জানি। কিন্তু আর কার কাছে যাবো মা? লছমীর গল্পে ইন্দুবালাও যেন কেমন খুঁজে পান নিজেকে। বিয়ের পরে একবারও যাওয়া হয়নি নিজের বাড়ি। কার কাছে যেতেন? কেউ ছিল না সেই পোড়া ভিটেয়। সেদিন ইন্দুবালা লছমীকে আর যেতে দেননি। পরের দিন বনধ। অনেক করে বলেছিলেন থেকে যা না লছমী। সারা রাত দুজনে গল্প করবো। সত্যি করেও ছিলেন তাই। কত কত যে গল্প দুজন দুজনের জন্য তুলে রেখেছিলেন তার হিসেব ওই জাব্দা খাতাও জানতো না। তুই যদি আমাদের গাঁও কি দরওয়াজার কাহানী শুনিস না মা তাজ্জ্ব বনে যাবি। ইন্দুবালা অতো সতো হিন্দি জানেন না। লছমীর সাথে থেকে একটু একটু করে কয়েকটা শব্দ বোঝে। গাঁও কি দরওয়াজা সে আবার কী রে? শুনে লছমী জিভ কেটেছিল লম্বা করে। হাই রাম! তুই গাঁও কি দরওয়াজা জানিস না মা? তাহলে শোন। গাঁওয়ের বাইরে একটা ছাউনি করে রাখা থাকা। সেখানে এসে বসে দূর গাঁও থেকে আসা মেহমান। রাম দুলার ওখানে বসেই ভজন করে। বরাতির থাকা হুয়া মেহমান ওখানেই রাতে নিন্দ যায়। ছররা সিং ওখানেই রাতে ছাগোল গুলোকে বেঁধে রাখে। আরও কত কি যে হয়। ওখানেই তো আমাদের মুখিয়া তার মেয়ের শাদিতে দশ গাঁওয়ের লোককে বৈঠ কর খিলালো। ওটা যখন দূর থেকে দেখতে পেতাম না মা, মনে হতো আমার গাঁও চলে এসেছি। আর যাবার সময় মনে হতো এই যে ছেড়ে যাচ্ছি আবার কখন ফিরতে পারবো? মাঝরাতে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। ইন্দুবালা হালকা

করে দেন। আরে আমাদের জলসত্রের মতো। বিশালক্ষ্মী তলায় ছিল তো। দূরের অচেনা অজানা পথিক তেষ্টার জল পেয়ে বিশ্রাম করতো। বোষ্টম বোষ্টমী ওখানেই সিধে পেয়ে দুটো চালে ডালে ফুটিয়ে খেত। গাঁয়ের বুড়োরা আড্ডা জমাতো ওখানেই। দুটো মেয়ে তাদের দুজনের সবচেয়ে ভালো লাগা জায়গা দুটোর গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠে ইন্দুবালা দেখেন লছমী নিজে উনুন ধরিয়েছে। আটার বড় বড় গোল গোল লেচি বানিয়েছে। তার মধ্যে ছাতু দিয়ে উনুনের আঁচে শেঁকছে। দিশি টমেটো সেদ্ধ করেছে। তার মধ্যে ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা এইসব দিয়ে একটা চাটনী করেছে। তোকে আমার কমলা গাঁওয়ের একটা খানা খাওয়াবো মা। ইন্দুবালা চেখে দেখেছেন অন্যরকম স্বাদ তার। শুকনো পিঠে যদি এইভাবে করা যেত? ছাতুর বদলে নারকেলের পুর। কী বলে রে এই খাবারটাকে লছমী? লছমী জানতে চায় আগে বলো ভালো লাগছে কী? আমার মরদ এক সাথে কত খেয়ে নিতো। বাচ্চারা আমার এই লেট্টি খাওয়ার জন্য বসে থাকে মা। আর চাটনি? পসন্দ হয়নি? খুব ভালো লেগেছে ইন্দুবালার। লছমী আমি তোর এই কমলা গাঁওয়ের চাটনিটা নিয়ে নিলাম রে। লেট্টি তো আর তোর মতো বানাতে পারবো না। চাটনিটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। সেদিন বিকেলে বাস ট্রেন চলার পরে লছমী চলে গিয়েছিল। কিন্তু গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেল ইন্দুবালার একটা না দেখা কমলা গ্রামকে। তার পাশ দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলা কমলা নদীকে। নদীর ধারে ছট পুজো। হোলিকে।

আজ যেন মনে হচ্ছে হেতালের মায়ের দোকানটা বড্ড বেশী দূরে। ধনঞ্জয়কে সঙ্গে আনতে পারলে ভালো হতো। রাগ করে এইভাবে ছুটে বেরিয়ে আসা মোটেই উচিৎ হয়নি ইন্দুবালার। যদি রাস্তায় পড়ে যান তাহলে একটা কান্ড ঘটবে। ঠিক যেমন হয়েছিল লছমীর। বুঝতে পারেনি ট্রেন আসছে। মাথায় ছিল মাছ ভর্তি ঝুড়ি। তাড়া ছিল বাজারে আসার। সেদিন আবার কালেক্টার অফিসের বড়বাবু বলেছিলেন কচু বাটা খেতে আসবেন। লছমীর

ঝুড়িতে ছিল মাছ। কাঁধের বস্তার বোঁচকায় ছিল বড় কচু, দিশি ছোট টমেটো, খুব ঝাল লঙ্কা, ধনে পাতা। অনেক ভোরে, কুয়াশার মধ্যে অন্যমনস্ক লছমী বুঝতে পারেনি ট্রেন এসে পড়েছে খুব কাছেই। পার হতে পারেনি লাইন। ছিটকে পড়েছিল মাছের ঝুড়ি। কাঁধের বস্তা। দেহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল ওই হাসিখুশি মুখটা। অনেক বেলায় খবরটা এসেছিল। ইন্দুবালা তখন কালেক্টার অফিসের লোকজন নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। ভেবেছিলেন লছমী আসেনি হয়তো শরীর খারাপ করেছে। কিন্তু মনে মনে দুশ্চিন্তাও করেছেন এমন কথার খেলাপ তো লছমী করে না। সব ভাবনা চিন্তা চাপা দেওয়ার জন্য ইন্দুবালা আরও রান্নার পদের লিস্ট বাড়িয়ে নিয়েছেন ততক্ষণে। কচুবাটার জায়গায় ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ছ্যাঁচড়া। সবাই গরম গরম ভাত দিয়ে খাবে। ঠিক সেই সময়ে রান্নাঘরের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো দয়ারাম। লছমীর সাথেই আসতো। তার পাশে বসেই মাছ বিক্রি করতো। দুজনের যত ঝগড়া ছিল তত ভাব। শুকনো মুখে দয়ারামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছ্যাঁক করে উঠেছিল বুক। কী হয়েছে রে দয়ারাম? দয়ারাম বসে পড়েছিল দোর গোড়ায় মাথায় হাত দিয়ে। চুপ করে শুনেছিলেন ইন্দুবালা। নিজের মনের ভেতরের তোলপাড় কাউকে বুঝতে দেননি তিনি। নিজে সব সময় ভেবে এসেছেন এই হোটেলের যদি কেউ অংশীদার থেকে থাকে তাহলে সে হল লছমী। তার সেই প্রথম দিনের টাকায় হোটেল শুরু না হলে কোনদিন ইন্দুবালা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন না। শান্তভাবে সবাইকে খাইয়ে। নিজে স্নান করে নতুন কাপড় পড়লেন ইন্দুবালা। দয়ারামকে নিয়ে নিজে গেলেন মর্গে। সেখানে একবার শেষ দেখা দেখবেন ভাতে কাপড়ে তাঁকে বাঁচিয়ে যাওয়া সেই কোন বিহারের কমলা গ্রামের মেয়েটিকে। যারা বাবা মা বিয়ে দেওয়ার নামে পণ দিয়ে বেচে দিয়েছিল কোন এক নেশাখোর মানুষের কাছে। লছমী চুপ করে শুয়ে ছিল মর্গের মেঝেতে তার হাসি হাসি মুখ নিয়ে। শুধু গলার কাছে ছিল একটা

চওড়া সেলাই। বসে পড়েছিলেন ইন্দুবালা মর্গের মেঝেতেই। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন মৃত লছমীর। এমন তো কথা ছিল না রে। উনুন ধরিয়ে

বসেছিলাম তোর জন্যে। তুই এলি না। কথা রাখলি না। এতো শুকনো চোখেও জল পড়ে ইন্দুবালার। ভেপসে ওঠা মর্গটাও যেন শোকের সজীবতা পায়।

লছমীকে দেখেই কাজ শেষ হয়ে যায়নি ইন্দুবালার। পুলিশের কাছে যে ফর্ম থাকে অসনাক্ত বডির সনাক্তকরণের সেইসব কিছু ফর্মালিটি করতে হল তাঁকেই। বাজারের একগাদা গরীব গুর্বো লোকের সাথে ভদ্রঘরের এক বিধবাকে দেখে পুলিশের লোকজন একটু অবাক হয়েছিল বটে তবে বিস্তারিত প্রশ্ন করার অবকাশ ছাড়েনি। লছমী যে তাঁর আত্মীয় হয় পুলিশের কাছে বলেছিলেন ইন্দুবালা। ঠিক কি ধরনের আত্মীয় যদি একটু বলেন দিদি? জানতে চেয়েছিল লোকাল থানার ওসি। ইন্দুবালা বলেছিলেন বোন। ঘুরিয়ে জানতে চেয়েছিল ওসি একজন বিহারী বাঙালীর বোন? ইন্দুবালা সরাসরি তাকিয়ে বলেছিলেন কেন হতে পারে না? আমার আপনার রক্তের হিসেব কার কাছে লেখা আছে স্যার? রক্তের আত্মীয়তাই কি সব? ওসি কথা এগোয়নি। এমনিতে বেশি মাল কড়ি পাওয়া যাবে না এদের কাছে। ফর্মে সই করে ছেড়ে দিয়েছিল। বেরিয়ে আসার সময় ইন্দুবালা দেখেছিলেন দরজার কাছে পড়ে আছে কচুটা, ঝুড়িটা। আইডেন্টিফিকেশানের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। কাউকে কিছু না বলে কচুটা আর ঝুড়িটা নিয়ে এসেছিলেন ইন্দুবালা। যিনি কোনদিন তাঁর স্বামীর একটা ছবি বাড়িতে রাখেননি তিনি তাঁর সখীর শেষ চিহ্নটুকু নষ্ট হতে দেননি।

দয়ারামকে সব খরচ দিয়েছিলেন ইন্দুবালা। লছমীর অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ সব কিছু। এমনকি লছমীর ছেলেকে ডেকে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়ে দশ হাজার টাকা। মায়ের জায়গায় ব্যবসা শুরুর জন্য। বাড়ি ফিরে খুব হালকা লেগেছিল তাঁর। খুব কাছের মানুষ চলে গেলে যেমন চারপাশ ফাঁকা হয়ে যায়। লছমী চলে যাওয়ার পরেও তাই মনে হয়েছিল। কিচ্ছু খাননি সেদিন সারাদিন। পরের দিন সকালে স্নান করে, উনুন ধরিয়ে কচু বাটতে বসেছিলেন। সেদিন হোটেলের মেনু ছিল গরম ভাত, কচু বাটা আর দেশি কাঁচা টমেটোর চাটনী। পরে সেটা নাম বদল করে রেখেছিলেন লছমী চাটনী। চাটনী হয়ে গেলে তার

ওপরে ছড়িয়ে দিতেন গন্ধরাজ লেবুর সুবাস। প্রথম ভাত নামার পরেই শাল পাতার থালায় তুলে নিয়েছিলেন সেদিন ইন্দুবালা। কচুবাটা আর চাটনী পাশে দিয়ে বাগানের নারকেল গাছটার তলায় রেখে এসেছিলেন। মাটির গ্লাসে ছিল জল। গড় হয়ে প্রনাম করে সেই খোলা বাগানে লছমীকে অনুরোধ করেছিলেন শেষবারের মতো ভাত খেয়ে যেতে। আর পেছন ফিরে তাকাননি। বাগানের দরজা বন্ধ করে ধনঞ্জয়কে বলেছিলেন আজকের পর থেকে কচুবাটা রান্নাটা বন্ধ তাঁর হোটেলে।
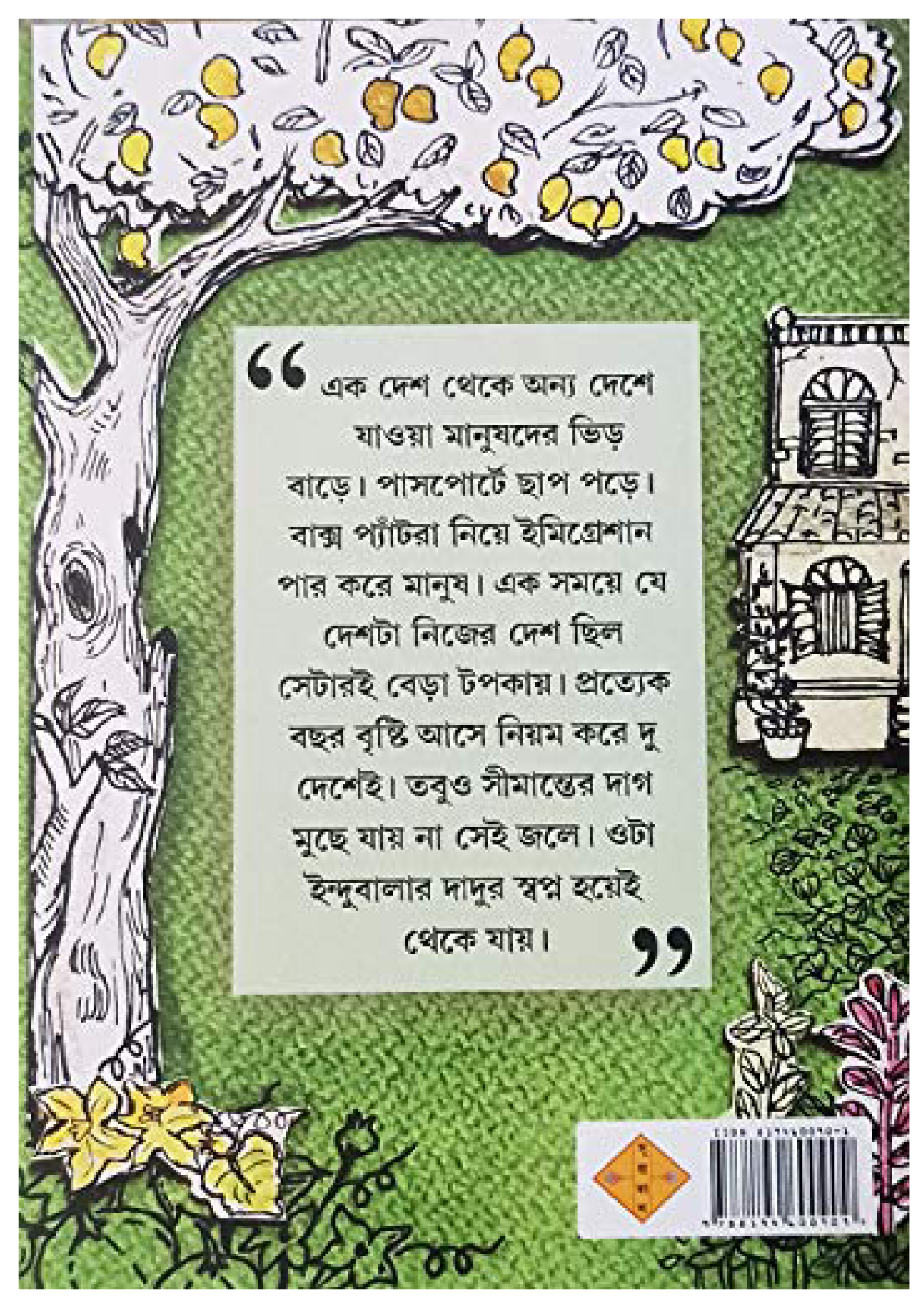
তাহলে এখন হঠাৎ এই অবেলায় অচেনা এক মেয়ের অনুরোধে ইন্দুবালা রাজী হয়ে গেলেন কেন আবার সেই রান্না করতে? কে জানে কার মধ্যে দিয়ে কে বারবার এই পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে। সেদিনে বিকেলে বাগান থেকে এসে ধনঞ্জয় বলেছিল মা শালপাতার থালা পরিষ্কার। একটা ভাতও নেই। শুধু কি তাই? জলটা পর্যন্ত খেয়ে গেছে গো। ইন্দুবালা ধমকে ছিলেন ধঞ্জয়কে। ওইভাবে বলতে নেই ধনা। মানুষ মারা গেলে ঈশ্বর হয়ে যান। এখনও কাঁচা মাছ আসলে প্রথমে ওই লছমীর ঝুড়িতেই রাখা হয় সব। তারপর সেখান থেকে সব ধুতে যায়। ভাজতে যায়। কিছু কিছু অদ্ভুত সংস্কার ইন্দুবালা আজও মনে মনে মেনে চলেন।

সেদিন হেতালের মায়ের দোকান বন্ধ ছিল। কাজেই ইন্দুবালাকে বেশ কয়েকদিন পর পর নতুন কচুর জন্য বাজারে হেতালের মাকে বলে রাখতে হলো। সেই বউটি অনেক খুঁজে পেতে সোনারপুর পেরিয়ে আরও কোন অজ গাঁয়ের থেকে কচু এনে দিলে ইন্দুবালা পরপর কয়েকদিন কচুবাটা করেলেন। ঝামেলা হল বিস্তর। চারপাশের লোকজন তো এলোই। কৃষ্ণনগর থেকে এলেন সেই অধ্যাপক অমলেন্দু। সঞ্চারী পরিচয় করিয়ে দিলো। কাঁচা পাকা দাড়ি, চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। চিনতে পারছেন না আমাকে দিদি? যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করলো তখনও বুঝতে পারেননি ইন্দুবালা। চশমা খুলতেই ঝন্টুকে চিনতে পারলেন তিনি। এমন জ্বর বাধিয়ে ছিল ছেলেটা নিজে গিয়ে খাবার দিয়ে আসতেন ইন্দুবালা।তোর মনে আছে লছমীকে ঝন্টু? ওই যে ঝুড়ি

করে মাছ দিয়ে যেতো আমাকে? ঝন্টু মনে করার চেষ্টা করে, পারে না। ধনঞ্জয় খ্যাচ খ্যাচ করে। কচুর ডাঁই পড়ে আছে। সেগুলো কখন কোটা হবে বাটা হবে কে জানে। ঝন্টু তার ব্যাগ থেকে কৃষ্ণনগরের সরভাজা বার করে দেয়। ইন্দুবালা সবাইকে বসতে বলেন। কচি কচুকে ভালো করে ধুয়ে, কুরে, নারকেল, সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিহি করে বেটে ওপরে ছড়িয়ে দেন কাঁচা সরষের তেল। গরম ভাতে সেই কচুবাটা নিমেষে শেষ হয়। সবাই হাপুস হুপুস শব্দ তোলে। কচি দেশি টমেটোর চাটনি লোকজন চেটেপুটে খায়। অনেকদিন পরে পড়ন্ত বেলায় রান্না ঘরের দরজায় লছমী এসে দাঁড়ালে ইন্দুবালা একটুও অবাক হন না। শুধু বিড়বিড় করে বলেন তোকে আজ আর কেউ মনে রাখেনিরে লছমী। লছমী হাসে। কোন কথা বলে না। শুধু চেয়ে থাকে ইন্দুবালার দিকে। কি বলতে চাইছে লছমী ইন্দুবালাকে? বিদায় বেলার আমন্ত্রণ?

ইন্দুবালার কেমন যেন শীত করে। তড়িঘড়ি দোতলায় ওঠেন। ধনঞ্জয়ের বেড়ে দেওয়া ভাতের থালা সরিয়ে রেখে কিচ্ছুটি না খেয়ে বারান্দায় একচিলতে রোদে আচার, কাসুন্দি আর বড়ির পাশে ঘুমিয়ে পড়েন। পশ্চিম দিকে পাটে যাওয়া বেলাশেষের একটু রোদ এসে পড়ে তার পরিতৃপ্ত শঙ্কাহীন মুখে।

সমাপ্ত

“এক দেশ থেকে অন্য দেশে
যাওয়া মানুষদের ভিড়
বাড়ে। পাসপোর্টে ছাপ পড়ে।
বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে ইমিগ্রেশান
পার করে মানুষ। এক সময়ে যে
দেশটা নিজের দেশ ছিল
সেটারই বেড়া টপকায়। প্রত্যেক
বছর বৃষ্টি আসে নিয়ম করে দু
দেশেই। তবুও সীমান্তের দাগ
মুছে যায় না সেই জলে। ওটা
ইন্দুবালার দাদুর স্বপ্ন হয়েই
থেকে যায়।”